সেপ্টেম্বর ২০১৭ ■ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা

সফল রাজনীতিবিদ থেকে দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহিত্যমানস

উন্নয়নের গতিধারায় তথ্য মন্ত্রণালয়

ত্যাগের মহিমায় ঈদুল আজহা

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়করাজ রাজ্জাকের প্রয়াণ

সচিত্র বাংলাদেশ
সেপ্টেম্বর ২০১৭ ■ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর ২০১৭ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৪

পবিত্র কাবা শরিফ তাওয়াফ করছেন আল্লাহর মেহমান সম্মানিত হাজিগণ

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এ বছর তাঁর ৭১তম জন্মদিন পালিত হবে। শেখ হাসিনা এবার নিয়ে তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তিনি বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলেছেন। দেশ ও জাতির ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুল প্রশংসিত। তিনি শুধু সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়কই নন, একজন সুসাহিত্যিকও। তাঁর রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্ম। এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ তাঁর সাহিত্যমানস এবং জীবন ও কর্মের ওপর পৃথক নিবন্ধ প্রকাশ করা হলো। ৭১তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা রইল।

অবাধ তথ্য প্রবাহ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয়। রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তরসমূহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে, যার অনেকগুলো এদেশে উন্নয়নের মাইলফলক হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের সময়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও সাফল্যের বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

২রা সেপ্টেম্বর ঈদুল আজহা, ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে শারদীয় দুর্গাপূজা। এসব বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়। এসডিজি বিষয়ক নিবন্ধ ও প্রতিবেদন এবং 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন এবারের সংখ্যার নতুন সংযোজন। এছাড়া এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত বিষয় যথারীতি স্থান পেয়েছে। আশা করি, সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; **স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।**

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

শেখ হাসিনা: সফল রাজনীতিবিদ থেকে দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ৪
অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

উন্নয়নের গতিধারায় তথ্য মন্ত্রণালয় ৭
মরতুজা আহমদ

শেখ হাসিনার সাহিত্যমানস ১২
বীরেন মুখার্জী

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ১৫
ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

কাবাঘরে রমজানের ইতিকাফ এবারের অভিজ্ঞতা ১৯
ড. মোহাম্মদ হাননান

উন্নয়ন ও সাফল্যের মহাসড়কে তথ্য মন্ত্রণালয় ২১
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

ত্যাগের মহিমায় ঈদুল আজহা ২৩
ম. মীজানুর রহমান

অর্থনৈতিক উন্নয়নে আয়কর, আয়কর মেলা ও রাজস্বের ভূমিকা ২৪
এম এ খালেক

অবাধ তথ্য প্রবাহ ও তথ্য মন্ত্রণালয় ২৮
মীর আকরাম উদ্দীন আহম্মদ

সুন্দরবনের সম্রাট বাঘ মামা ২৯
আ ন ম আমিনুর রহমান

নবায়নযোগ্য শক্তি ও বাংলাদেশ ৩১
ফজলে রাব্বি খান

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং কিছু কথা ৩২
মোহাম্মদ কায়ছার আলী

শারদীয় দুর্গাপূজা: সম্প্রীতির মেলবন্ধন ৩৩
আনোয়ার ফরিদী

বাংলাদেশে আদিবাসী প্রসঙ্গ ৩৪
জান্নাতে রোজী

মাতৃদুগ্ধ: শিশুর জীবনীশক্তি বিকাশে সহায়ক ৩৫
লতা খান

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়করাজ রাজ্জাকের প্রয়াণ ৩৬
সুলতানা বেগম

কাশের বনে লাগলো হাওয়া ৩৭
মঈনুল হক চৌধুরী

জাতির পিতার ৪২তম শাহাদত বার্ষিকীতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালন ৪৬

হাইলাইটস

গল্প

রংধনু ৩৯
জামিউর রহমান লেমন

ঠিকানা: বৃদ্ধনিবাস ৪১
নাসিম সুলতানা

কবিতাগুচ্ছ ৪২-৪৫
মনজুরুর রহমান, সোহরাব পাশা, ফয়সাল শাহ, দেলওয়ার বিন রশিদ, আ.শ.ম. বাবর আলী, চন্দনকৃষ্ণ পাল, দেলোয়ার হোসেন, রেজাউদ্দিন স্টালিন, সাঈদ তপু, স্বপন মোহাম্মদ কামাল, মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ, শম্পা প্রদীপ্তি, মানজুর মুহাম্মদ, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, সামসুন্নাহার ফারুক, কামরুল ইসলাম সাইদ, রীনা তালুকদার, ওয়াসীম হক, রুস্তম আলী, তাহমিনা

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৮
প্রধানমন্ত্রী ৪৮
তথ্যমন্ত্রী ৪৯
জাতীয় ঘটনা ৫০
আমাদের স্বাধীনতা ৫১
উন্নয়ন ৫১
আন্তর্জাতিক ৫২
শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ ৫৩
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫৪
শিক্ষা ৫৫
প্রতিবন্ধী ৫৫
স্বাস্থ্যকথা ৫৫
সংস্কৃতি ৫৬
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৭
যোগাযোগ ৫৭
কৃষি ৫৮
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯
জেন্ডার ও নারী ৬০
সামাজিক নিরাপত্তা ৬০
নিরাপদ সড়ক ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
মাদক প্রতিরোধ ৬২
শিল্প-বাণিজ্য ৬৩
চলচ্চিত্র ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

শেখ হাসিনার সাহিত্যমানস

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি শুধু সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়কই নন; একাধারে মমতাময়ী এবং সংবেদনশীল। সংবেদনশীল মননের অধিকারী হওয়ায় রাষ্ট্র-সমাজ-মানুষ এবং পরিপার্শ্বকে তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যেমন দেশের সংকট মোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জঙ্গি দমন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতায়ন, বৈষম্য নিরসন, শিক্ষাবিস্তার, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নসহ প্রতিটি খাতে সঠিক পরিকল্পনা ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন; তেমনিভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের নানা ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এবং লেখনির মাধ্যমে নিজের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়ে চলেছেন। রাজনৈতিক জীবনের মতো শেখ হাসিনার সাহিত্যিক জীবনও অত্যন্ত বর্ণিল এবং সমৃদ্ধ। এ নিয়ে বীরেন মুখার্জীর বিশেষ নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-১২

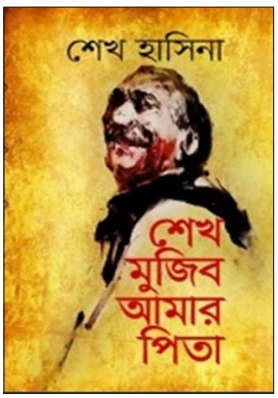

উন্নয়নের গতিধারায় তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়নের সুযোগ গ্রহণ করে অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক তথ্যের প্রবাহ ধারায় জনগণকে সম্পৃক্ত, অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয়। বর্তমান সরকারের ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'রূপকল্প-২০৪১' সফল করে তুলতে গণতন্ত্র এবং সুশাসন সুনিশ্চিত করতে জাতীয় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ সুনিশ্চিত, সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা ইতোমধ্যে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং-এর অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে শামিল রেখে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় গত সাড়ে ৮ বছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অগ্রণী ভূমিকা অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ নিয়ে তথ্য সচিব মরতুজা আহমদ-এর নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৭

ত্যাগের মহিমায় ঈদুল আজহা

ইসলাম শান্তির, সাম্যের ও ত্যাগের ধর্ম, সম্পূর্ণ ভোগের নয়। এমন এক সত্য, সুন্দর ও সাম্যের মানবিক ধর্ম প্রবর্তন করে গেছেন হজরত মোহাম্মদ (স.), যার চিরন্তনতাকে নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ তিনি রেখে যাননি। ইসলাম অর্থাৎ শান্তি, যার প্রয়াসে আমাদের জীবনচেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে হয় প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত। ঈদুল আজহা সেই পবিত্র ত্যাগের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। এ নিয়ে প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-২৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শেখ হাসিনা : সফল রাজনীতিবিদ থেকে দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাত্রিতে সপরিবার বঙ্গবন্ধু ঘাতকদের হাতে নিহত হলেন। কেবল শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় শত্রুর নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পেলেন। বাবা-মা, ভাই-বোনদের মৃত্যু সংবাদে শেখ হাসিনা ভেঙে পড়লেন। শত্রুর আঘাত আসতে পারে ভেবে ইউরোপের জীবন পেছনে ফেলে তিনি স্বামীসহ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। নির্বাসিত জীবন থেকে দলীয় নেতাদের বিশেষ অনুরোধে ও কর্তব্যবোধে তাড়িত হয়ে শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার দিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ছিল। দুর্যোগ উপেক্ষা করেও বিমানবন্দরে লাখ লাখ মানুষ তাদের মহান নেতার কন্যাকে দেখতে ও স্বাগত জানাতে ভিড় জমালেন। দেশে ফিরে আসার আগেই শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর অর্জন কম নয়। এই সময়টাকে বরং তাঁর রাজনৈতিক পরিপক্কতার কাল হিসেবে বর্ণনা করা যায়। দেশে ফিরেই তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তিনি সংসদে প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হলেন ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর আসনে বসলেন। জনস্বার্থ বিবেচনা করে তিনি ১৯৮৮ সালে পদত্যাগ করেন। তারপর যুগপৎ আন্দোলন-সংগ্রাম। এর মধ্যে তাঁকে কয়েকবার হত্যার প্রচেষ্টা হয়েছে। এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করা হয় তিনি সেই জোটেরও প্রধান ছিলেন। এরশাদ শাসনামলে তিনি বেশ কয়েকবার গৃহবন্দি ছিলেন। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে তিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯০ সালে ১৫ দলের নেত্রী শেখ হাসিনার প্রচণ্ড গণআন্দোলনে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলেন। জনপ্রিয়তা, একাগ্রতা ও অনমনীয়তার কারণে সবাই ধরে নিয়েছিল ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনাই প্রধানমন্ত্রী হবেন। শতাংশের হারে বেশি ভোট পেয়েও সূক্ষ্ম কারচুপির কারণে আওয়ামী লীগ বিএনপি অপেক্ষা কম আসন পেল; যে কারণে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর আকর্ষণীয় পদটি থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। জাতি বঞ্চিত হলো মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের নেতৃত্ব থেকে এবং তার মূল্যও জাতিকে দিতে হলো বহুভাবে। ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামী গোলাম আযমকে দলের আমির হিসেবে ঘোষণা দিলে দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। একাত্তরের ঘাতক-দালালবিরোধী আন্দোলন শুরু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহবায়ক হিসেবে জাহানারা ইমাম ও সদস্য-সচিব হিসেবে ড. আবদুল মান্নান চৌধুরীর নির্বাচনে শেখ হাসিনার সক্রিয় সমর্থন ছিল। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল ঘাতক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমসহ '৭১-এর সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচার, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মীয় স্থানগুলোতে রাজনীতি বন্ধ করা। আন্দোলনে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ প্রধান শরিক সংগঠন হিসেবে যোগ দেয়। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে আন্দোলনকারী শক্তি বিশেষত বুদ্ধিজীবীগণ অফুরন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করে। ১৯৯২ সালেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১০১ জন সংসদ সদস্যের আন্দোলনের ফলে গণআদালতের ২৪ জন তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহীর মুক্তি এবং গোলাম আযমের বিচারসহ ৪ দফা প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়। ঘাতকবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি সরকার পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী কয়েকটি নির্বাচনের দাবি তুলে শেখ হাসিনা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁকে শারীরিকভাবে শেষ করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে। তবু তিনি অকুতোভয়ে এগিয়ে যান। এই সময় তাঁর নেতৃত্বে কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিলের আন্দোলন বেগবান হয়। তিনি যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে তখন একটি প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির ওই নির্বাচনের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ওই নির্বাচন দিয়ে বিএনপি পুনরায় ক্ষমতার অধিকারী হয়। কিন্তু সংসদের একটি অধিবেশনের পর সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের ঘোষিত নির্বাচন ষড়যন্ত্রের কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১২ জনের বেশি সেনা কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মুক্তিযোদ্ধা জনতার মঞ্চ তৈরি হয়। একটানা ২২ দিন জনতার মঞ্চ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচারণায় এবং শেখ হাসিনার কৌশলী পদক্ষেপের কারণে ১২ই জুনের দল নিরপেক্ষ নির্বাচনে তিনি প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পর থেকে তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত স্বরূপ উদঘাটিত হতে শুরু করে।

জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত হওয়ার পর শেখ হাসিনা জনগণের ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেন। এই লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও নীতি প্রণীত হয়ে ধাপে ধাপে সেসব বাস্তবায়িত হয়েছিল। জনমঙ্গল নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অংশ হিসেবে তিনি সংসদীয় কমিটিগুলো গঠন ও পুনর্গঠিত করেন। এসব কমিটিতে মন্ত্রীর পরিবর্তে কোনো সাংসদকেই চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তাঁর সরকার গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে ও উন্নয়নের হাতিয়ার ও বাহন বানাতে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান করে।

তবে তাঁর প্রথমবারের সরকারের বিশাল অর্জন হচ্ছে ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিচুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও ইনডেমনিটি বিল রদ করে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিচার কর্মের সূচনা। এগুলো ছিল অনেক পুরনো সমস্যা। পানি সমস্যা পাকিস্তান আমলের আর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রায় ২৪ বছরের পুরনো ছিল। আত্মঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রচুর রক্ত ঝরিয়েছে; স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছিল এবং বহির্বিশ্বে মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালির ভাবমূর্তিকে চুরমার করে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সংকট সৃষ্টি করেছিল। শেখ হাসিনা তাঁর কৌশলী নেতৃত্বে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এই অঞ্চলকে দেশের মূল স্রোতের সাথে সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। গঙ্গার পানিচুক্তি ও পার্বত্য শান্তিচুক্তির ফলে উন্নয়নের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্তসহ প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে। তাঁর সরকারের এইসব ইতিবাচক পদক্ষেপের স্বীকৃতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও মিলেছে।

বিশ্বের একাধিক শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেখ হাসিনা সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। তাঁর আপন বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক একাধিক শান্তি পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু কাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উপমহাদেশের পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধের প্রচেষ্টায় দেশে-বিদেশে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। শান্তি প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান অনন্য বলেই নোবেল পুরস্কার তিনি পাবেন বলে প্রত্যাশা ছিল। তাঁরই মডেলে আয়ারল্যান্ডে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করায় দু'আইরিশ নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। তাই সব মিলিয়ে তাঁর অর্জনকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সে আমলের অপর একটি বিশাল অর্জন হচ্ছে বিশ্বের ১১তম দীর্ঘতম সেতু বঙ্গবন্ধু সেতুর উদ্‌বোধন। ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন তাঁর প্রথম শাসনামলের দু'বছর পূর্তিতে এটা উদ্‌বোধন করা হয়। আগের আমলে সেতুটির কাজ শুরু হলেও মাত্র দু'বছরে এই সেতুর তিন-চতুর্থাংশ কাজ সমাপ্ত করে তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেন। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন– সম্প্রীতি, সংযুক্তি ও উন্নয়নের দুয়ার খুলে দিয়েছে এই সেতু। তাঁর আমলের অপর একটি অর্জন হচ্ছে কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল, যা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের পথ সুগম করেছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ঘাতকদের বিচার না করে প্রচলিত আদালতেই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। কিন্তু ২০০২ সালে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এই বিচারের রায় কার্যকর না করলেও শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে তা কার্যকর করেন। জাতির প্রত্যাশা মোতাবেক শেখ হাসিনা বিশেষ আদালতে নিষ্পত্তি না করে প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে বিচারকার্য শেষ করে দূরদর্শিতা নয়, রাষ্ট্রনায়কসুলভ আচরণের প্রমাণ রাখলেন আরো একবার।

তাঁর শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা পূর্বে কোনো আমলে এমনটি হয়নি। দুস্থ মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে তাঁর সরকার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও বহু নির্মাণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। 'একটি বাড়ি, একটি খামার' এক অনন্য কর্মসূচি। বেকারদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। বন্যা ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্ম অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করে শেখ হাসিনা দেশি ও বিদেশিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম শাসনামলে যেখানে বিদেশি পত্রিকার পূর্বাভাস ছিল যে আকস্মিক বন্যায় দু'কোটি মানুষ মারা যাবে, সেখানে মালের ক্ষতি মাত্রাতিরিক্ত হলেও মানুষ মরেছে ২ হাজারেরও অনেক কম, তাও কয়জন না খেয়ে মরেছে সে তথ্য বিরোধী পক্ষও উপস্থাপন করতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪০ লাখ টন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দুটো বন্যা হয়েছে। এ সত্ত্বেও খাদ্যে উদ্বৃত্ত অর্জন ম্যালথাসের তত্ত্বকে নিঃসন্দেহে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। শেখ হাসিনা যখন ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন, তখন দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ ছিল ২৫ লাখ টন। তখন খাদ্য আমদানির পরিবর্তে রপ্তানির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকলেও প্রথম শাসনামলে তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল নগণ্য। তাঁর ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। অনেক মন্ত্রীই ছিলেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। একটি শক্তিশালী অথচ আক্রমণাত্মক বিরোধী দল ছিল। ছিল একটি গণবিরোধী অদক্ষ আমলাতন্ত্র। সুকৌশলে সমাজের প্রতিপক্ষ শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র ছিল। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা সফলভাবে তাঁর মেয়াদ সমাপ্ত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান লতিফুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তিনি তাঁর সাফল্যের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে নির্বাচনে কোনো কৌশলী ভূমিকাও নেননি। লতিফুর রহমান ও তাঁর মিত্রদের কূটকৌশলে ও নগ্ন পক্ষপাতিত্বের কারণে এতসব বিশাল অর্জনের পরও নির্বাচনে তাঁর দলের পরাজয় ঘটে। আবারও বাংলাদেশই শুধু সংকটে নয়, শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত জীবনও অপরিমেয় সংকটে নিপতিত হয়। তাঁকে মেরে ফেলার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে। চারদলীয় জোটের শাসনামলে ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট-এর গ্রেনেড হামলায় তিনি প্রাণে রক্ষা পান। ২০০২-২০০৮ সাল পর্যন্ত দুর্যোগময় সময় পার করেন। এই সময়ে তাঁকে জেলে নেওয়া হয়, নির্বাসনে পাঠাবার চেষ্টা অব্যাহত থাকে; এমনকি তাঁকে রাজনীতি থেকে চির উচ্ছেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এসব সত্ত্বেও তিনি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। এতসব প্রতিবন্ধকতা ঠেলে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো সরকার গঠন করেন। নির্বাচনের বহু আগেই তিনি 'দিন বদলের সনদ' নামে নিজ দলের রূপকল্প ঘোষণা করেন। তাঁর মিশন ও পর্যায়ক্রমে করণীয় সম্পর্কে আগেই ইশতাহার জারি করেন। তন্মধ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত, সন্ত্রাস নির্মূল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান অন্যতম ছিল। মেয়াদান্তে প্রতিশ্রুত লক্ষ্যের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে

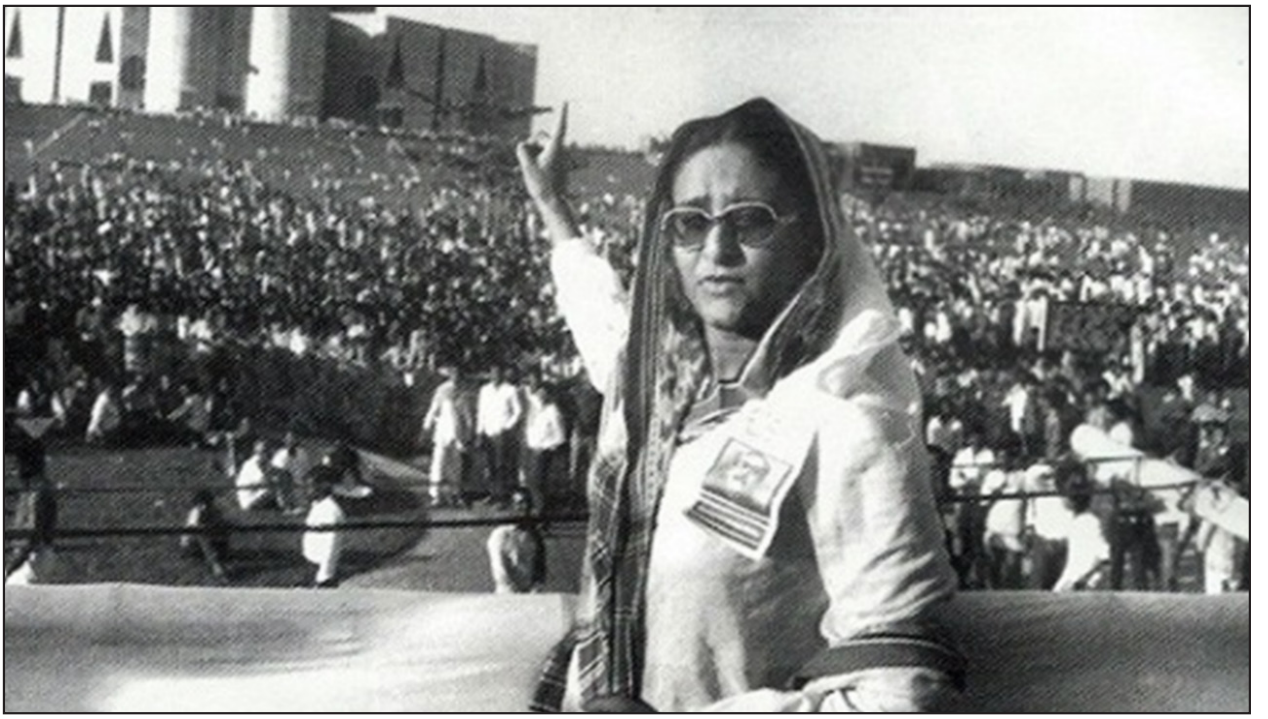

১৭ই মে ১৯৮১ দেশে ফিরে এসে শেরেবাংলা নগরে সমবেত জনতার মাঝে শেখ হাসিনা

বেশি অর্জিত হয়েছে।

২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি দিন বদলের স্লোগান এবং ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী পালন ও ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফিরে আসেন। বিগত মেয়াদে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মঙ্গা বিতরণ কর্মসূচিকে বেগবান করা হয়। বর্তমানে মঙ্গা ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যে পাটের জীবনবৃত্তান্ত উদঘাটিত হয়েছে। বিভিন্ন রকমের উচ্চ ফলনশীল ও দ্রুত ফলনশীল খাদ্যের উদ্ভাবন ঘটিয়ে মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। 'একটি বাড়ি, একটি খামার' কর্মসূচির পুনঃসূচনার কারণে এবং ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টন কর্মসূচি খাদ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ক্ষমতায় বসার কয়েকদিনের মাথায় মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ তথা বিডিআর বিদ্রোহ তাঁর শাসনকে আলোড়িত করেছে। তিনি যে দক্ষতা, দৃঢ়তা ও দ্রুততার সাথে সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তা ইতিহাসে অনন্য হয়ে থাকবে।

সম্প্রতি বিডিআর বিদ্রোহীদের বিচার সমাপ্ত হয়েছে। একসাথে ১৫২ জনের ফাঁসি এবং ৮ হাজার জনের একই সময়ে বিচার ইতিহাসে অনন্য। নিজ দলের উসকানিদাতাকেও তিনি রেহাই দেননি। ক্ষতিগ্রস্ত ৫৭ সেনা সদস্যের পরিবারকে তিনি স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা ছাড়াও ব্যাপক আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। অনুরূপ আর একটি ঘটনা তথা ২০১৩ সালের ৫ই মে হেফাজতে ইসলামের অভ্যুত্থানকে তিনি সুকৌশলে প্রতিহত করেন এবং দেশের মানুষের জানমাল ও শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন।

গণপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত করতে বিভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা হয়েছে। পদোন্নতি ছাড়া বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে সচিবসহ পদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কোথাও কোথাও পৃথক বেতনভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও অন্যান্য সকল কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ ৬৫ বছর করা হয়েছে। পদ সৃষ্টি, পদ বিন্যাস ও পদমর্যাদা সুবিন্যাস করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস করা হয়েছে। পিতৃত্বকালীন ছুটির কথাও বিবেচনাধীন আছে। তাছাড়া কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ানো হয়েছে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ, ২০১৩ সালে ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হয়েছে; বিচারপতিদের বেতন ৫০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। শিগগিরই স্থায়ী পে-কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হবে। শ্রমিকদের গড় বেতন ৪১৭৫ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ৫৩০০ বলবৎ করা হয়েছে। বিদেশে ২৫ লাখ মানুষের নামমাত্র খরচে কর্মসংস্থান করা হয়েছে। বিদেশগামীদের সুবিধার জন্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। বিদেশগামী নির্বাচনে লটারির ব্যবস্থা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যেমন যুগান্তকারী পদক্ষেপ লটারির মাধ্যমে ক্লাস ওয়ানের শিক্ষার্থী নির্বাচন। দেশে প্রায় ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যসীমা ৪০ ভাগ থেকে ২২ ভাগে নেমে এসেছে।

১৯৯৬ সাল থেকে তিনি প্রমাণ করতে শুরু করেছেন তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ নন, একজন সফল রাষ্ট্রনায়কও। বিশ্ব অঙ্গনেও তাঁর ব্যাপক পরিচিতি। জাতিসংঘে উত্থাপিত তাঁর শান্তি ও উন্নয়নের মডেল আবারও বিশ্বে সাড়া জাগাতে শুরু করেছে। শেখ হাসিনা বলতে গেলে সারাজীবন দুর্যোগ ও দুঃসময়ের যাত্রী। মনে হয় স্রষ্টা তাঁকে দিয়ে মহৎ কিছু করিয়ে নেওয়ার জন্য ভয়াবহ আক্রমণসমূহ ও বিধ্বংসী গ্রেনেড হামলা থেকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। আশা করা যাচ্ছে– মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দুস্থ, বয়স্ক, নিরন্ন, অসহায়, দুর্বল, বিধবা, মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের নয়নমণি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের এযাবৎ ইতিহাসে অনন্য ভূমিকার জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই শুধু নয়, একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নয়নের গতিধারায় তথ্য মন্ত্রণালয়

মরতুজা আহমদ

লাখো বাঙালির রক্তের বিনিময়ে অর্জিত লাল-সবুজের বাংলাদেশ এবং এদেশের মাটি ও মানুষের সমৃদ্ধির প্রতিটি ধাপে সৃজনশীল সহযোগী হিসেবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃপ্ত শপথকে বাস্তবায়িত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তিত দিকনির্দেশনায় তথ্য মন্ত্রণালয় যে গতিপথ নির্দিষ্ট করেছে, তা জাতির পিতার উৎসারিত আদর্শ তথা বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য-ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমৃদ্ধি ঘটায়। সরকারের সৃজনশীল নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয় দেশের বিশেষত সরকারের অনুসৃত নীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করে। এর ফলে সরকারের অনুসৃত নীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সচেতন জনগণের সম্পৃক্ততা তৈরি করা, দেশ-বিদেশে দেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ 'দিন বদলের সনদ: রূপকল্প–২০২১' বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, যা এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়নের সুযোগ গ্রহণ করে অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক তথ্যের প্রবাহ ধারায় জনগণকে সম্পৃক্ত, অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয়। বর্তমান সরকারের ঘোষিত 'রূপকল্প–২০২১' এবং 'রূপকল্প–২০৪১' সফল করে তুলতে গণতন্ত্র এবং সুশাসন সুনিশ্চিত করতে জাতীয় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ সুনিশ্চিত, সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা ইতোমধ্যে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং-এর অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে শামিল রেখে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অগ্রণী ভূমিকা অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

পেছনের কথা

একুশ শতকের এ প্রান্তে এসে তথ্য মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব-গুণে উজ্জ্বল। এর জন্য পেরুতে হয়েছে বহু পথ। ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর প্রাদেশিক সরকারের নীতি ও বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে নিয়ন্ত্রিত 'তথ্য বিভাগ' নামে একটি দপ্তর গঠন করার মধ্য দিয়েই আসলে যাত্রা শুরু করেছিল এ মন্ত্রণালয়। তৎকালীন ১৯টি জেলা তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাঙালির সর্বাত্মক যুদ্ধ 'মুক্তিযুদ্ধ' শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল এই সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। বারোটি মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালিত হতে শুরু করে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অন্যতম প্রধান মন্ত্রণালয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ছিল বহুমুখী, সফল ও সর্বজনবিদিত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে কী অভূতপূর্ব উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছিল, তা আজ ইতিহাসের অংশ। এছাড়া বিরূপ পরিস্থিতিতেও পত্রপত্রিকা, ছোটো ছোটো পুস্তিকা, লিফলেট ইত্যাদির নিয়মিত প্রকাশনার মাধ্যমে রণাঙ্গনের যুদ্ধের বিবরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা, শরণার্থী শিবিরের অবস্থা ও মানুষদের মানবেতর জীবনযাপন, বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে জুলাই ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫' প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

স্বীকৃতির জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান, পাকিস্তানিবাহিনীর গণহত্যার খবর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশ করা হতো। স্বাধীনতার জন্য সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর সেই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে যুদ্ধকালীন প্রচারণার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সফল কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়।

এদেশের মুক্তিকামী জনগণের সাথে একাত্মতাবোধ করেছিলেন স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত তৎকালীন 'তথ্য বিভাগ' এবং পরবর্তীকালের 'তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়'-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। বর্তমানে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম, অমর একুশ, ৬-দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধ ও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম কিংবা জাতির পিতার ওপর গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু আজ বিভিন্ন চলচ্চিত্র মাধ্যমে বা টিভি চ্যানেলে দেখা যায়, তা মূলত তৎকালীন 'তথ্য বিভাগ' এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন 'তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়'-এর আওতাধীন 'চলচ্চিত্র বিভাগ-এর (পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর) সৃষ্টি। সেই ইতিহাসও কম গৌরবময় নয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ লাভের পর ১৯৭২ সালে 'তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়' নামে মন্ত্রণালয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'তথ্য মন্ত্রণালয়' হলেও আওতাধীন তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফিল্ম-আর্কাইভ, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, তথ্য কমিশন এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট–এ চৌদ্দটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনকল্যাণে সার্বিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়টি। বিগত সাড়ে আট বছরে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সরকারের নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রকাশনার কাজটি সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কাজে তথ্য মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সহায়তা করছে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নির্মিত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনাসমূহ, যা বাংলাদেশ টেলিভিশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের মাধ্যমে জনগণের সচেতনতার মূলে পৌঁছাচ্ছে। দেশের সবচেয়ে পুরোনো *সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা নবারুণ* নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতেও ভূমিকা রাখছে।

দেশের অন্যতম পুরোনো পাক্ষিক পত্রিকা *সচিত্র বাংলাদেশ* এবং ইরেজি ত্রৈমাসিক *বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি*-এর মাধ্যমে দেশে-বিদেশে রাষ্ট্র ও সরকারের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রচারিত হচ্ছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী নতুন সহস্রাব্দে পৃথিবীর সব দেশের, বিশেষত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে জাতিসংঘ ঘোষিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (MDGs) অর্জনে বাংলাদেশকে বলা হয় 'রোল মডেল'। এই অর্জনে জনসম্পৃক্ততা ছিল অন্যতম প্রধান কারণ, যার পেছনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নানা কর্মসূচি ও প্রকল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় নির্ধারিত মাথাগুনতি দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের গভীরতা হ্রাস, অপুষ্টিজনিত স্বল্প ওজনের শিশুর সংখ্যা কমানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা আনা, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার কমানো এবং তাদের জন্য পতঙ্গ-নিরোধক মশারির ব্যবস্থা, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় ও নিরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ইস্যুভিত্তিক চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত হওয়ায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা

২০১৬ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৬১০-এ 'তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এবং মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ' করার কথা বলা হয়েছে (Ensure Public Access to Information and Protect Fundamental freedoms, in according with nation legislation and international agreement)। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে সরকার আর জনগণের মাঝে আন্তঃযোগাযোগ কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করা, গণমাধ্যমের জন্য সহায়ক আইনি পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রশ্নে গণমাধ্যমকে সর্বদা সজাগ রাখতে কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে Action Plan এবং Monitoring Farmwork প্রণয়ন করেছে। এতে সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণ-এই তিনটি অংশের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনকেই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সরকার নিশ্চিতভাবে সচেতন আছেন যে, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার সমান্তরাল বিকাশ, আইনের শাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সর্বোপরি জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপনে গণমাধ্যমের সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ১০ উদ্যোগ ও এসডিজি'র ১৭টি গোল এবং ১৬৯টি টার্গেট অর্জনে তথ্য মন্ত্রণালয় আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

দেশে বর্তমানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক মিলে মোট পত্রিকার সংখ্যা ২৮৫৫টি। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র নিয়ে সরকারি ৪টি ও অনুমোদনপ্রাপ্ত ৪৪টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মধ্যে ২৬টি সম্প্রচাররত। পাশাপাশি সম্প্রচারিত হচ্ছে ২১টি এফএম বেতার ও ১৭টি কমিউনিটি রেডিও।

বর্তমানে দেশে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করছে এবং এতে গণমাধ্যমসমূহ গণতন্ত্র ও সুশাসন সুসংহত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, তথ্য কমিশন গঠন ও আইন বাস্তবায়নে বিধি-প্রবিধি তৈরিসহ এ সংক্রান্ত নানা নির্দেশনা জারি এবং সর্বোপরি সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের প্রচেষ্টায় তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বিগত বছরে দেশে তথ্য প্রবাহে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। বর্তমান সরকার নতুন নতুন সংবাদপত্র, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল, এফএম বেতার তরঙ্গ, অনলাইন পত্রিকা প্রকাশে অনুমতিসহ সার্বিক সহায়তা করছে, যা অবাধ তথ্য

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৯শে জুলাই ২০১৭ জাতীয় সংসদ ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭'-এর অনুমোদন প্রদান করা হয় –পিআইডি

প্রবাহ, গণমাধ্যমের বিকাশ ও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের স্বাক্ষর বহন করে। তথ্য মন্ত্রণালয় এখন পরিচিত হয়ে উঠেছে গণমাধ্যমবান্ধব, চলচ্চিত্রের কল্যাণমুখী এবং গণযোগাযোগের দক্ষ ব্যবহার সম্বন্ধে সচেষ্ট ও নিবেদিতপ্রাণ মন্ত্রণালয় হিসেবে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচার ও প্রসারে শক্তিশালী হাতিয়ার এখন এ মন্ত্রণালয়টি। এ অবস্থান সৃষ্টির পেছনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট কর্মসূচি অবদান রেখেছে, যা আরেকটু বিস্তারিতভাবে না বললেই নয়।

ক. গণমাধ্যমবান্ধব তথ্য মন্ত্রণালয়

গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তদারকি এই মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ। সাংবাদিকদের জন্য ৮ম ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮-এর আলোকে প্রণীত বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৮ সালে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রিন্ট মিডিয়ার স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে 'বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা ২০০৮' সংশোধনপূর্বক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য গঠিত '৮ম সংবাদপত্র ওয়েজ বোর্ড' কর্তৃক সুপারিশকৃত রোয়েদাদ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য অনুসরণীয় 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪' মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন এবং এর আওতায় অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের মাঝে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)–এ অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপনসহ ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালনার জন্য একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সাংবাদিকতায় মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের উন্নয়নে ২০০৯-১০ অর্থবছরে তথ্য অধিদফতর ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় EMTAP কর্মসূচির আওতায় 'Strengthening Development Communication between Government and Stakeholders' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ (১ম পর্যায়)', 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় সংবাদ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার নিজস্ব জমিতে একটি ভবন নির্মাণের জন্য 'বাসস ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রকল্প 'একসেস টু ইনফরমেশন' (এটুআই-এর আওতায় 'মিডিয়া ক্যাম্পেইন ফর ডিসিমিনেটিং আউটকাম অব এটুআই প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

'তথ্য অধিকার আইন'টি ২০০৯ সালের ২৯শে মার্চ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ৫ই এপ্রিল ২০০৯ সালে আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অপর ২ জন তথ্য কমিশনারের সমন্বয়ে ২০০৯ সালের ১লা জুলাই ৩ সদস্যবিশিষ্ট 'তথ্য কমিশন' গঠন করা হয়। 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'-এর বিধান অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ১ জন নারী কমিশনের সদস্য হয়ে থাকেন, যা এই আইনের উল্লেখযোগ্য দিক। আইনটি সম্পর্কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের অবহিত করার জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ নাগরিক তথা কিশোর-কিশোরীদের অবহিত করতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে এই আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ. চলচ্চিত্র কল্যাণমুখী তথ্য মন্ত্রণালয়

চলচ্চিত্র নির্মাণে অবকাঠামোগত সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান, জাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত চলচ্চিত্র এবং ভিডিও ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কাজ করছে মন্ত্রণালয়টি। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৩রা এপ্রিলকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাণে সহযোগিতা প্রদানের জন্য 'পি-ফিল্ম মঞ্জুরি নীতিমালা ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

'উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা ২০০০' সংশোধন করে 'উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী, প্রতি অর্থবছরে ২টি করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি অনুদান প্রদানের জন্য নিয়মাবলি, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জাতীয়

চলচ্চিত্র পুরস্কারের ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকা মূল্যমানের আজীবন সম্মাননা এবং পোশাক ও সাজসজ্জা নামক ২টি নতুন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকের ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০ হাজার টাকা বৃদ্ধি এবং শিল্পী ও কলাকুশলীদের ৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র সংসদ/ক্লাব নিবন্ধন ও পরিচালনার জন্য The Film (Registration and Regulation) Act, ১৯৮০ আইনটি রহিত করে নতুনভাবে 'চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা ও কলাকুশলী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩' প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট'। উক্ত আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অস্থায়ীভাবে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ভবনে ১লা নভেম্বর ২০১৩ কার্যক্রম শুরু করেছে। ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৪-এ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রথম কোর্সের (চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্স) আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন।

চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে যুগের সাথে। এসেছে প্রযুক্তির নিত্য নতুন উপস্থাপন। যুগোপযোগী চলচ্চিত্র জগৎ তৈরির লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করছে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও বিদেশি সাংবাদিকদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের ওপর প্রামাণ্যচিত্র 'বাংলার মাটি বাংলার জল', বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র ওপর নির্মিত 'অসমাপ্ত মহাকাব্য'সহ মোট ১৩৬টি প্রামাণ্যচিত্র, ১৪৪টি সংবাদ চিত্র ও ৭২টি বিশেষ সংবাদচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫ লাভ করেছে এই অধিদপ্তর নির্মিত তথ্যচিত্র 'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি'। 'ডিজিটাল প্রোডাকশন অব ডকুমেন্টারি অ্যান্ড ফিচার ফিল্মস' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ায় এই অধিদপ্তরটি সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মাণে সক্ষম হবে। ভিভিআইপিগণের দৈনন্দিন কার্যক্রম ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথমবারের মতো প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফিক ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুরূপ আরো ১টি ক্যামেরা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে পুরাতন ফিল্ম যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সুরক্ষা করা হচ্ছে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মাধ্যমে। প্রায় ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২২ কোটি ৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে 'চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বিএফডিসি-তে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত 'বিএফডিসিকে আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত প্রায়। ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত 'কবিরপুর ফিল্ম সিটি' স্থাপন সম্পর্কিত প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদিত হওয়ার পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড বর্তমান সরকারের সময়ে সর্বমোট ৬৭২টি চলচ্চিত্রকে সেন্সর সনদপত্র প্রদান করেছে; যার মধ্যে ৩৭৫টি ডিজিটাল চলচ্চিত্র এবং ২২১টি ৩৫ মি.মি.-এর চলচ্চিত্র রয়েছে। বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ৮৭৯টি বিদেশি চলচ্চিত্রকে বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে। মোট ২১৯টি আমদানিকৃত চলচ্চিত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়করণের জন্য অনাপত্তি দেওয়া হয়েছে এবং ঐ সকল চলচ্চিত্রের সেন্সর সম্পন্ন করা হয়েছে। অশ্লীলতা রোধে দপ্তরের কর্মকর্তারা নিয়মিত দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ পরিদর্শন করে থাকেন।

গ. আপামর জনসাধারণের তথ্য হাতিয়ার

দেশের সবচেয়ে পুরোনো সম্প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। স্বাধীনতা সংগ্রামে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অবিস্মরণীয়। 'ধামরাইস্থ পুরাতন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের বিকল্প হিসেবে একই শক্তিসম্পন্ন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন' এবং 'বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২টি এফএম ট্রান্সমিটার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। 'বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ' এবং 'কবিরপুর কেন্দ্রে ১টি ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্র উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন, 'বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ডিজিটাইজেশন ও আধুনিকীকরণ', 'বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ কমপ্লেক্স আগারগাঁও, ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক এবং বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের চত্বরে নির্মিত 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ভাস্কর্য সম্প্রসারণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৩রা এপ্রিল বিএফডিসি প্রাঙ্গণে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৭'-এর শুভ উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, জাতীয় সংসদ কার্যক্রম, কৃষি, শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' নামে একটি পৃথক চ্যানেল চালু করা হয়েছে। 'বিটিভি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ' বাস্তবায়ন, বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত)', বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনসহ চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় বিটিভি'র বার্তা বিভাগের জন্য নতুন ক্যামেরা, কম্পিউটার, এডিটিং প্যানেল ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডের অনুষ্ঠান ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে IPTV এবং Web TV এর মাধ্যমে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি বুলেটিন ইশারা ভাষায় উপস্থাপিত হচ্ছে।

তথ্য ভবন

এক ছাদের নিচে সরকারের তথ্য নেটওয়ার্ক জনগণের তথ্য অধিকারকে নিশ্চিত করবে–এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ৯৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'তথ্য ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১২ই আগস্ট ২০১৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের জমিতে 'তথ্য ভবন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করেন। ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১০টি বিশেষ উদ্যোগের ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন এ পর্যন্ত মোট ৩০টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান নির্মাণ করেছে। প্রামাণ্য অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার, থিম সং তৈরি ও প্রচার, নিয়মিত ফিলার প্রচার করা হচ্ছে। বেসরকারি টিভির মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতি সপ্তাহে 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' শিরোনামে ১৫ মিনিটের বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের প্রকল্প পরিচালকগণসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। জেলা, উপজেলায় স্থানীয় জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে ৬২টি 'বহিরাঙ্গন' অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানসমূহের তথ্য, অডিও, ভিডিও চিত্র সরাসরি ধারণপূর্বক স্ব স্ব কেন্দ্রের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ ফেসবুকে আপলোড করার মাধ্যমে বহুমাত্রিক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৮টি দপ্তর বা সংস্থার অনুকূলে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। এর ফলে উদ্যোগসমূহ সফল করতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টারসহ নানাবিধ প্রচার কার্যক্রম।

উন্নয়নের গতিধারায় তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকৃতপক্ষে, সরকারের প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় নিজ নিজ ভিশন ও মিশনের আলোকে নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। আর তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষত্ব হলো– নিজ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে দেশের উন্নয়ন এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার প্রয়োজন হলে তথ্য মন্ত্রণালয় তা যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে জনগণ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন ও তথ্য জানতে আগ্রহী। তথ্য প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমও এখন নানাবিধ এবং নানামুখী। এর ফলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জও বেড়ে গেছে বহুগুণ। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে প্রস্তুত জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনায় তথ্য মন্ত্রণালয় ক্রমশ এর পরিসর বিস্তৃত করছে। তথ্য ক্যাডারের মানোন্নয়ন, দেশব্যাপী তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে নতুন নতুন তথ্য উইং সৃষ্টির মাধ্যমে কেবল দেশে নয়, বিদেশেও বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে তথ্য মন্ত্রণালয়। দেশের ভাবমূর্তি বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য বিদেশে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেস উইং রয়েছে। বর্তমানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ২টিসহ মোট ৮টি প্রেস উইং-এর মাধ্যমে কার্যক্রম চলছে এবং আরো ১২টি দেশে প্রেস উইং খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি চূড়ান্ত করা হয়েছে 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭'। বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে রেডিও, টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থির ও চলমান চিত্র, ধ্বনি লেখা ও মাল্টিমিডিয়ার অন্য কোনো রূপে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ বা সম্প্রচারকারী বাংলাদেশি নাগরিক বা বাংলাদেশি নিবন্ধিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে 'অনলাইন গণমাধ্যম' বোঝাবে। অনলাইন গণমাধ্যমের ধারণা এখন আর কেবল ধারণায় আবদ্ধ নেই, এটি এখন বাস্তবতা। তথ্য মন্ত্রণালয় এই বাস্তবতাকে দ্রুত অনুধাবন করে গণমাধ্যম নীতিমালার আলোকে 'অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা' করেছে। অনলাইন মিডিয়াটা যেন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করে নীতিমালায় সেই গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে, উদ্দেশ্যও বলা আছে। অনলাইন সংবাদমাধ্যম পরিচালনার জন্য জাতীয় সম্প্রচার কমিশনের কাছ থেকে নিবন্ধন নিতে হবে। এ কমিশন গঠিত হবে জাতীয় সম্প্রচার আইনের অধীনে, যা প্রণয়নের কাজ চলছে। এ আইনে কমিশনের কাজ ও গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা থাকবে। জাতীয় সম্প্রচার কমিশন অনলাইন সংবাদমাধ্যমের জন্য গাইডলাইন তৈরি করবে। আর কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয় অনলাইন সংবাদমাধ্যমের দেখভাল করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় অনলাইন গণমাধ্যমের একটি তালিকা তৈরি করেছে। তাতে বিদ্যমান অনলাইনের সংখ্যা ১৮০০। নীতিমালায় থাকছে অনলাইন গণমাধ্যমের খসড়া নীতিমালার তথ্য-উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ করার কথা। সব ধর্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই সংবাদ পরিবেশনের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

এভাবে বাস্তবতার নিরিখে গণমাধ্যমের কল্যাণে এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করছে তথ্য মন্ত্রণালয়। অবাধ তথ্য প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ সুসংহত হতে পারে বলে বিশ্বাস করি। আর এলক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় দৃঢ়তার সাথে কাজ করছে, যার সুফল প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে বলে আস্থা রাখা যায়।

লেখক: সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

শেখ হাসিনার সাহিত্যমানস

বীরেন মুখার্জী

যে অন্তর্দাহ টিএস এলিয়টে, সেই একই অন্তর্দাহ নজরুল, জীবনানন্দ হয়ে সমকালের কবি–সাহিত্যিকদের মাঝেও দেখা যায়। রকমফের থাকলেও অন্তর্দাহ থেকে উৎসারিত উপলব্ধিই যে একজন সৃজনশীল ব্যক্তিকে সৃজনকর্মে উদ্বুদ্ধ করে, তা বলা যেতে পারে। একজন সত্যিকারের স্রষ্টাকে সীমাহীন দুঃখবোধের ভেতর দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। অতিক্রম করতে হয় শতসহস্র বাধাবিপত্তি, পেরিয়ে আসতে হয় কণ্টকাকীর্ণ পথ। বিশ্বসাহিত্যে যাদের নাম খ্যাতির শীর্ষে উচ্চারিত হয়, তাদের প্রত্যেকের জীবনেই অপার দুঃখ-কষ্ট-বেদনাবোধের গল্প আছে, আছে জেল-জরিমানা এবং লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার চরমতম ইতিহাস। এমনই এক দিগন্ত বিস্তৃত দুঃখের সমুদ্রে বসবাস করে, ষড়যন্ত্র, বিষাদ আর যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে, সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি শুধু সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়কই নন; একাধারে মমতাময়ী এবং সংবেদনশীল। সংবেদনশীল মননের অধিকারী হওয়ায় রাষ্ট্র-সমাজ-মানুষ এবং পরিপার্শ্বকে তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যেমন দেশের সংকট মোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জঙ্গি দমন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতায়ন, বৈষম্য নিরসন, শিক্ষা বিস্তার, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নসহ প্রতিটি খাতে সঠিক পরিকল্পনা ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন; তেমনিভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের নানা ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এবং লেখনির মাধ্যমে নিজের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়ে চলেছেন। রাজনৈতিক জীবনের মতো শেখ হাসিনার সাহিত্যিক জীবনও অত্যন্ত বর্ণিল ও সমৃদ্ধ।

‘লেখক হিসেবে শেখ হাসিনা মূলত প্রাবন্ধিক, বিশেষভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তাঁর *নির্বাচিত প্রবন্ধ* সংকলন গ্রন্থটি বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক

ব্যক্তিত্বের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সে কারণেই এ গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম’– শেখ হাসিনার *নির্বাচিত প্রবন্ধ* গ্রন্থের ভূমিকায় ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যখন এই মূল্যায়ন করেন, তখন লেখক হিসেবে শেখ হাসিনার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে ওঠে। শেখ হাসিনার সাহিত্যিক মননের সন্ধান করতে হলে তাঁর লেখাগুলো পাঠ অত্যন্ত জরুরি। এটা ঠিক যে, আমাদের দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে লেখালেখির অভ্যাস খুব বেশি নেই। অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন, রাজনীতিবিদরা যদি তাদের নিত্যদিনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথাও একটু কষ্ট করে টুকে রাখতেন, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এত সহজে বিকৃত করা সম্ভব হতো না। সামরিক শাসকদের অপকর্মও চাপা পড়ে যেত না। বাংলাদেশে হাতে-গোনা যে ক’জন রাজনীতিবিদ লেখালেখি করেন তাদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কীভাবে লেখার সময় বের করেন, তা অনেককেই ভাবায়। পাশাপাশি তিনি একজন একনিষ্ঠ পাঠক। প্রবীণ সাহিত্যিকদের রচনা থেকে শুরু করে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের তরুণ লিখিয়েদের রচনাও তিনি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। ২০১০-এর জানুয়ারিতে মাওলা ব্রাদার্স

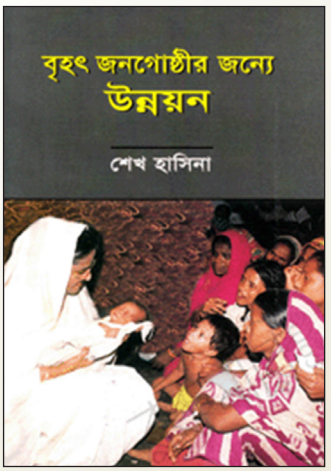

থেকে প্রকাশিত *শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র*-এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন, ‘বই পড়ার অভ্যাস আমার শৈশব-কৈশোর থেকে এবং সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করায় আমি এ ভুবনে একজন মুগ্ধ অনুরাগী শুধু।’

শেখ হাসিনা তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রাম, কারাভোগ, নির্যাতন, দুঃখ-কষ্টের সমান অংশীদার। পিতা যখন জেলে বন্দি থেকেছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন–কন্যার মনে সে নির্যাতনের দাগ কীভাবে আঁচড় কেটেছে, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে- তা তাঁর লেখনিতে স্পষ্ট। পিতার সংগ্রামী জীবন, মুক্তির লড়াই, ২১-দফা থেকে ছয় দফা–কন্যা হয়ে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান মাতাপিতার আদর-স্নেহ পেয়েছেন, নির্যাতন-নিপীড়নে তাঁদের সান্ত্বনা পেয়েছেন, সংগ্রাম ও রাজনীতিতে উৎসাহ পেয়েছেন; কিন্তু শেখ হাসিনার পাশে তাঁর আপনজন কেউ ছিল না। মাতাপিতাকে হারাতে হয়েছে, প্রিয় ভাই-ভাবি, আত্মীয়-পরিজন হারাতে হয়েছে তাঁকে। পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে দেশ-বিদেশে। স্বাধীন দেশও শেখ হাসিনার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। বলা যেতে পারে, এসব বেদনাজনক ঘটনাবলিই শেখ হাসিনার সৃজনশীলতাকে বেগবান করেছে। একটি গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, ‘কোনোদিন নিজে লিখব এ কথা ভাবিনি।... সময়ের দাবি আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। পিতার স্বপ্ন

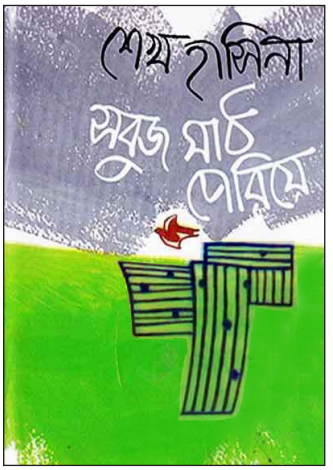

ছিল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আমি এই আদর্শ নিয়ে বিগত ২৮ বছর যাবৎ জনগণের সেবক হিসেবে রাজনীতি করে যাচ্ছি। চারপাশে দেখা ঘটনা, মানুষের স্বপ্ন ও জীবনকে আমি যেভাবে দেখেছি এবং জেনেছি, তাই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।' শেখ হাসিনার এই স্বীকারোক্তি সরল এবং ভণিতাহীন। ভণিতা করে আর যাই হোক সাহিত্যসৃজন সম্ভব নয়, বিশেষজ্ঞরা এমনই বলেন। শেখ হাসিনার মধ্যে কোনো কপটতা নেই। তিনি যা দেখেন, তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা করেন, তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিশ্লেষণ করেন।

শেখ হাসিনার ব্যক্তি জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তিনি কৈশোরে ছিলেন ছায়ানটের শিক্ষার্থী। তিনি বেহালা বাজাতেন এবং ছবি আঁকতেন। পিতা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত পাঠাগারও ছিল সমৃদ্ধ। নতুন কোনো বই বাসায় এলে ভাইবোনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে আগে পড়বেন তা নিয়ে। বঙ্গবন্ধুও অবসর সময়ে তাঁর ভরাট কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর মা ছিলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। পাশের বাসার ফুফু ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল নীলিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে তিনি অধ্যাপক আবদুল হাই, শহিদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মতো পণ্ডিতদের সান্নিধ্য পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। ফলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, পারিবারিক সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলেই তাঁর সাহিত্যমানস গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে ছাত্রাবস্থায় তা বিকশিত হয়।

শেখ হাসিনার *ওরা টোকাই কেন* বহুল আলোচিত একটি বই। সেখানে তিনি সমাজের অবহেলিত শিশু-কিশোরদের দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক দলগুলো মিছিলের স্বার্থে ছোটো শিশুদের ব্যবহার করে থাকে, যা শেখ হাসিনাকে ভাবিয়েছে, যা সচরাচর গতানুগতিক ধারার কোনো রাজনীতিবিদকে ভাবায় বলে জানা যায় না। ছিন্নমূল এসব শিশু কেন গ্রাম থেকে শহরে এসে মানবেতর জীবনযাপন করে, তা নিয়ে তিনি ভেবেছেন। পর পরই তিনি লিখেছেন সামাজিক বৈষম্যের কথা, মানুষের দুর্নীতি, এমনকি বড়ো রাষ্ট্রগুলোর বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কেনা প্রসঙ্গ। তিনি শিশুদের জন্য সবচেয়ে বেশি যে প্রয়োজনের কথা ভেবেছেন তা হলো, পারিবারিক আশ্রয়। সমস্যা সমাধানের এই যে ভিশন তা তাঁকে অন্য লেখকদের চেয়ে পৃথক করে নিঃসন্দেহে। ১৯৭৫-পরবর্তী দুঃসময়ে দীর্ঘদিন ছিলেন দূর প্রবাসে, দেশে ফিরে গৃহবন্দি হওয়া এবং বার বার ঘাতকের বুলেটের টার্গেট হওয়ার কথা তিনি লিখেছেন। শুধু নিজেরই নয়, তিনি লিখেছেন দেশের দুঃখী মানুষের কথা, তাদের জীবনের সংগ্রাম আর কষ্টের কথা। তিনি এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের বিভিন্ন উপায় পাঠকের সামনে আনেন। কোন পথটি ভালো সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করে ফেলেন পাঠককে। ফলে তার গদ্য পাঠ শেষে পাঠক এক ধরনের ভাবনার ভেতর নিমজ্জিত হন।

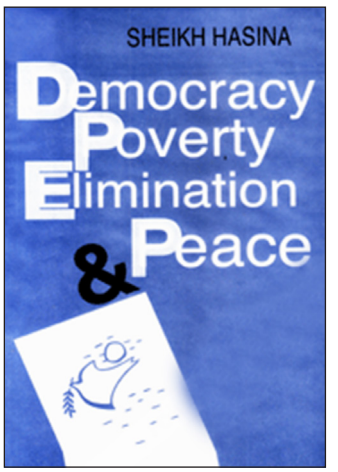

সবুজ মাঠ পেরিয়ে শিরোনামের প্রবন্ধে শেখ হাসিনা লিখেছেন–'সামনে সবুজ মাঠ। সংসদ ভবন এলাকার গাছে গাছে সবুজের সমারোহ। এই সবুজেরও কত বাহার। সামনে একটা শ্বেতকরবীর গাছ, যার পাতা গাঢ় সবুজ। বৃষ্টিতে ভিজে যায় গাছের পাতা। কখনোবা হাওয়ায় পাতাদের ঝিরিঝিরি শব্দ শুনি। গণভবনের সেই পাখিদের কথা মনে পড়ে। তারাও এখানে উড়ে উড়ে আসে। অনেক কথা মনে পড়ে, অনেক স্মৃতি ভেসে আসে। নিঃসঙ্গ কারাগারের এই স্মৃতি আমার এখন সঙ্গী।' ১০ই জুন ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংসদের একটি বাড়ি সাব-জেল ঘোষণা করা হয়। সেখানেই বসে এ নিবন্ধটি তিনি রচনা করেন। রচনার শুরুতে ছোটো ছোটো বাক্যে তিনি দেশের, প্রকৃতির যে চিত্রকল্প আঁকেন–তা গল্পের মতোই গতিশীল। একজন প্রকৃত পাঠক প্রবন্ধটি পাঠ করতে গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি লিখেন, 'বারান্দায় দাঁড়ালেই দৃষ্টি চলে যায় সবুজ মাঠ পেরিয়ে রাস্তায়, যে রাস্তা দিয়ে অনবরত ছুটে চলেছে গাড়ি। কত মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। খুব সকালে অনেক গাড়ি থাকে, যারা প্রাতঃভ্রমণ করতে আসে তাদের গাড়ির ভিড়। রাস্তা পার হলেই গণভবন। চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করলেই রাস্তার ওপারে ঘন গাছের সারি। অনেক উঁচু লম্বা গাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে নারকেল গাছ। আর নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গণভবন, যেন উঁকি মারছে। রাতের বেলা গাছের পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। ভোরবেলা শালিক আসত। ক্যাঁচক্যাঁচানি পাখিরাও আসত। একটা বানর ছিল হৃষ্টপুষ্ট। সে রোজ আসত আমার কাছে। কখনো সকাল ১০টা-১১টা, কখনো বেলা আড়াইটায়। কলা ও অন্যান্য ফল খেতে দিতাম। একবার জ্বর হওয়ায় আমি খেতে দিতে পারিনি। কারারক্ষী মেয়েদের হাতে খেতে চাইল না। তখন একটা পেঁপে গাছে উঠে পেঁপে খেয়ে কারারক্ষী মেয়েদের ভেংচি কেটে চলে গেল। ফজরের নামাজ পড়ে বারান্দায় বসে কোরান শরিফ পড়তাম। তারপর পায়চারী করতাম। একটা বাতাবি লেবুর গাছ ছিল, সেখানে বসে পাখিরা খুব চ্যাঁচামেচি করত। আমি দেখে বলতাম, ওরাও আন্দোলনে নেমেছে। ওদের দাবি মানতে হবে। ওদের খাবার দিতে হবে। খাবার দিতাম, ওরা খেয়ে চলে যেত।'

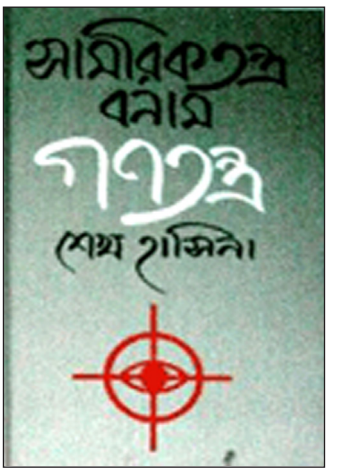

তাঁর এ রচনাটি গল্পের আবহে এক দার্শনিক রচনা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বন্যাদুর্গত মানুষের সঙ্গে রচনাটি শেখ হাসিনার ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেখা অভিজ্ঞতার এক অসাধারণ চিত্র। ২০শে আগস্ট তিনি ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়া যান। প্রায় এক মাস পরে ঢাকা ফেরেন ১৫ই সেপ্টেম্বর। ত্রাণ দিতে গিয়ে জলচৌকি থেকে উঁচু মাচায় উঠতে গিয়ে আহত হন। সে সময়ের অভিজ্ঞতা, কষ্টের সেই বর্ণনা তিনি দেন–'হারাকান্দি গ্রামের আব্দুর রহমান, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে মাচা বেঁধে শুয়ে আছে। হঠাৎ পানিতে খলখলানি আওয়াজ। আব্দুর রহমান ভাবল নিশ্চয়ই কোনো বড়ো মাছ। কোচখানা নিয়ে জায়গাটি দেখে আঘাত করল। কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল জলের প্রাণীটি। রক্তে লাল হয়ে গেল জায়গাটি। পানিতে নেমে মাছ তুলতে গিয়ে তুলে নিয়ে এল নিজের সন্তানের লাশ। ঘুমের মধ্যে শিশুটি পানিতে পড়ে গেলে মাছ মনে করে তাকে আঘাত করে তার পিতা। আজ সেই শিশুর পিতামাতা পাগলপ্রায়।' বলার অপেক্ষা রাখে না, শেখ হাসিনার এই বর্ণনা যেমন মহাকাব্যিক তেমনি তাঁর ভেতরের দরদি সত্তার পরিচয়ও প্রতিভাত। *স্মৃতির দখিন দুয়ার* প্রবন্ধে তিনি তাঁর রঙিন শৈশবকে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন–'গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামখানি এক সময় মধুমতি নদীর তীরে ছিল। বর্তমানে মধুমতি বেশ দূরে সরে গেছে। তারই শাখা হিসেবে পরিচিত বাইগার নদী এখন টুঙ্গিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে কুলকুল ছন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। রোদ ছড়ালে বা জ্যোৎস্না ঝরলে সে নদীর পানি রুপোর মতো ঝিকমিক করে। নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান, পাট, আখ, ক্ষেত, সারি সারি খেজুর, তাল, নারকেল, আমলকি গাছ, বাঁশ কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতাপাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা লম্বা সতেজ ডগা। শালিক, চড়ুই পাখিদের কলকাকলি, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক। সব মিলিয়ে ভীষণরকম ভালো লাগার এক টুকরো ছবি যেন। আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে এ টুঙ্গিপাড়া গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল–সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড়ো হয়ে উঠি।' এভাবেই প্রাকৃতিক সরল দৃশ্যের বর্ণনা করতে করতে প্রবন্ধগুলোতে তিনি দেশ ও জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের কথা বলেছেন। আলোচনা করেছেন রাষ্ট্রের নানা ক্ষত নিয়ে। চিহ্নিত করেছেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার নানা দিক, আবার সমস্যা সমাধানের নানা উপায়েরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এভাবে লেখনির মাধ্যমেও তিনি প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

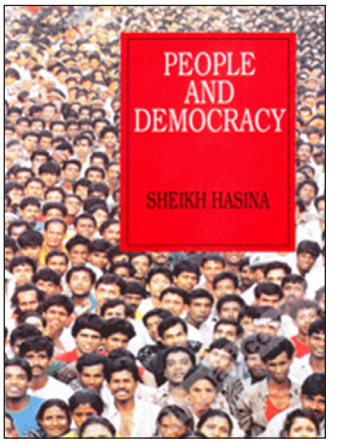

শেখ হাসিনার *নির্বাচিত প্রবন্ধ* গ্রন্থটি নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই। বিভিন্ন সময়ে লেখা ১৩টি প্রবন্ধ নিয়ে গ্রন্থটি এ বছর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভুক্ত 'বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম' প্রবন্ধটি ১৯৯৩ সালে লেখা। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে স্বৈরাচারের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একজন রাজনীতিবিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। *শিক্ষিত জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত* প্রবন্ধে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাকে চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের নানা কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' প্রবন্ধে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা সত্ত্বেও বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে দেশে দেশে, মানুষে মানুষে এবং একই দেশে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানবতার যে চরম অবমাননা তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে *ভালবাসি মাতৃভাষা*, ২০০২ সালে প্রকাশিত *বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা*, ১৯৯৮ সালে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়ি নিয়ে *স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার*, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে ২০০১ সালে লেখা *সংগ্রামে আন্দোলনে গৌরবগাথায়*, ১৯৯৯ সালে লেখা বৃহৎ *জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন*, *সহে না মানবতার অবমাননা*, *প্লিজ, সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলুন*, *একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা* এবং ১৯৯১ সালের ১৪ই আগস্ট লেখা *অনর্জিত রয়ে গেছে স্বপ্নপূরণ* এবং হাইকোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায় নিয়ে ২০০৫ সালে লেখা *সত্যের জয়* সংকলিত হয়েছে নির্বাচিত প্রবন্ধ গ্রন্থে। *সত্যের জয়* প্রবন্ধ নিয়ে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেছেন–'এই প্রবন্ধে আইনের শাসনের প্রতি শেখ হাসিনার গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে।'

প্রবন্ধগুলো পাঠে শেখ হাসিনার সাহিত্য ও রাজনৈতিক মানস অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন আবহে তৈরি বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রবন্ধগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নে পরিকল্পনা–সম্পৃক্ততা–চিন্তা–মানবিকতা–সর্বোপরি প্রকৃতি-পরিবেশসহ যাপনের যেসব অনুষঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে, তা অনেক সময় তার ব্যক্তি বেদনাবোধকেও ছাপিয়ে গেছে। প্রতিফলিত হয়েছে দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর একান্ত সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং পক্ষপাতিত্ব।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও গণমাধ্যমকর্মী

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশে সাধারণ্যে চলচ্চিত্র সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ জন্মেছে। দেশের মানুষ ভালো ও বিশ্বমানের চলচ্চিত্রের রসাস্বাদন করতে চায়। এর প্রমাণ প্রতিবছর ঢাকাসহ সারাদেশে এখন শুধুমাত্র বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর সংখ্যক স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, প্রদর্শনী, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। শুধুমাত্র ঢাকা শহরে চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য ছোটোবড়ো প্রায় ৩০টিরও অধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাপান এবং বাংলাদেশের যৌথ অর্থায়নে ৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বহুমাত্রিক ও অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন' নির্মিত হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট'-এর মতো প্রতিষ্ঠান। চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক ও কারিগরি দিক এবং নান্দনিক নির্মাণকৌশলের ওপর বেসরকারি এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমিত পরিমাণ অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে দেশে। মুদ্রিত ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমসমূহেও প্রতিনিয়ত চলছে তুমুল আলোচনা ও বিনোদন সম্প্রচার। পাশাপাশি দেশব্যাপী প্রায় ৩০০ প্রেক্ষাগৃহে প্রতিদিন প্রতিটিতে চলছে একেকটি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ৪টি করে নিয়মিত প্রদর্শনী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদে বিল উত্থাপন ও আইন পাস করার মাধ্যমে এদেশে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (ইপিএফডিসি) প্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নবম জাতীয় সংসদের ১৮তম অধিবেশনে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট' (BCTI) প্রতিষ্ঠার বিল পাস করার ঘটনাই হলো স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, ২০১১ সালের আগস্ট মাসে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সংগঠক তারেক মাসুদ এবং সিনেমাটোগ্রাফার ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মিশুক মুনীরের মৃত্যুতে দেশব্যাপী গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এর আগেও চলচ্চিত্র জগতের উঠতি অথবা তরুণ নায়ক-নায়িকার মৃত্যু হলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কখনো কখনো সাময়িক শোকের আবহ সৃষ্টি হলেও এ দুজনের অকাল প্রয়াণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তরুণ, ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, চলচ্চিত্রকর্মী, বুদ্ধিজীবী মহল পর্যন্ত সকলেই শোকে হতবিহ্বল ও মোহ্যমান। অবশ্য তাঁরা দুজনই অত্যন্ত জনপ্রিয়, সম্ভাবনাময় ও সৃজনশীল মানুষ ছিলেন। তবুও বাংলাদেশে চলচ্চিত্র অঙ্গনের কারো মৃত্যুতে এমন প্রতিক্রিয়ার ঘটনা অভূতপূর্ব। আমার মতে, চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের মানুষের প্রবল ও ক্রমবর্ধমান আগ্রহেরই তা বহিঃপ্রকাশ।

তবে দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আবহ যতটা পরিণত, এর মান ততটা উন্নত নয়। বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের মতে লগ্নিকারকদের অতিমাত্রার বাণিজ্যিক স্বার্থ এজন্য অনেকাংশে দায়ী। তবে মান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলেও, চলচ্চিত্র এখনো বাংলাদেশের মানুষের বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। অনেকে চলচ্চিত্রকে শুধু প্রমোদমাধ্যম ভাবলেও চলচ্চিত্র জীবনসংগ্রাম ও সমাজ-বাস্তবতার প্রতিরূপ ধারণে সক্ষম, আধুনিক পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য এক গণশিল্পমাধ্যম। কারণ সমকাল, নান্দনিকতা ও মননশীলতাকে একই সাথে বহন করে চলচ্চিত্র।

আমরা জানি, একটি দেশে চলচ্চিত্রের আধুনিক আত্মপরিচয় নির্মাণে প্রয়োজন যেমন শক্তিমান চলচ্চিত্রকারের, তেমনি সমানভাবে প্রয়োজন বোদ্ধা দর্শক তৈরির। প্রয়োজন চলচ্চিত্রের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং এর প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ (ডিপ্লোমা) প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্‌বোধন করেন

সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন সাধন। কারণ একজন উত্তম চলচ্চিত্রকার উত্তম দর্শকের জন্য অপেক্ষায় থাকে। একজন কবির যেমন বিশিষ্ট পাঠক প্রয়োজন, ঠিক তেমনি চলচ্চিত্রের জন্যও প্রয়োজন সমঝদার দর্শক। সংস্কৃতির শৈল্পিক প্রকাশ, শিক্ষা ও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের বিকাশ, জাতি গঠনের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার এবং চলচ্চিত্রকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিও তাই খুবই জরুরি। কারণ এভাবেই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে চলচ্চিত্রকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশে এখন বিপুল পরিমাণ চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। ঢাকা ও দেশের অন্যান্য বড়ো শহরে আয়োজিত হচ্ছে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আলোচনা ও স্মরণোৎসব। প্রকাশিত হচ্ছে চলচ্চিত্র জার্নাল ও নানা ধরনের চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক গবেষণা ও প্রকাশনা। চলচ্চিত্র সংসদকর্মী ও চলচ্চিত্র পিপাসু ব্যক্তিবর্গ আয়োজন করছেন চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক নানা ধরনের মননশীল উৎসব, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, রেট্রোসপেকটিভ। চলচ্চিত্র উদ্যোক্তা, শিল্পী, কলাকুশলী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সংসদকর্মী, ছাত্রছাত্রী আর উৎসুক তরুণ-তরুণীর স্বতঃস্ফূর্ত মিলনমেলায় পরিণত হচ্ছে এসব উৎসবস্থল। তাই বলার সময় এসেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এখন বিনোদনের গণ্ডি পেরিয়ে সংস্কৃতি চর্চার জ্যোতিকেন্দ্রে স্থাপিত হচ্ছে ক্রমশ। দেশে সূচনা ঘটছে নতুন যুগের চলচ্চিত্র আন্দোলনের।

দেশীয় চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ সাধনে আজ তাই চলচ্চিত্রের নিয়মিত প্রদর্শনী, আলোচনা, বিশ্লেষণ, গবেষণা, মতবিনিময়, সেমিনার-ওয়ার্কশপ আয়োজনের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু চলচ্চিত্রের পঠন-পাঠনের নিমিত্তে চাই একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল। এজন্য একটি সাধারণ মিলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাও খুবই জরুরি। তাই চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য নিবেদিত একান্ত নিজস্ব একটি পূর্ণাঙ্গ মিলন কেন্দ্র তথা 'জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। যেমন– দেশে ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা একাডেমি, শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিল্পকলা একাডেমি ইত্যাদি। দেশের সামগ্রিক চলচ্চিত্র চর্চার উন্নত পরিমণ্ডল সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত এই জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র হবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতি সাধনের কেন্দ্রবিন্দু।

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র কী?

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র হলো একটি দেশের চলচ্চিত্র আন্দোলন ও চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের সাথে যুক্ত সকলের মিলনস্থল। এখানে থাকবে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, অধ্যয়ন ও গবেষণা তথা সার্বিক চলচ্চিত্র চর্চার সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। চলচ্চিত্রকে ঘিরে বিমলানন্দ লাভ, চেতনা বিকাশ ও সুস্থ বিনোদনের একটি বৃহত্তর ও উদার আবহ সৃষ্টি করতে হবে এখানে।

পৃথিবীতে অগ্রসর সংস্কৃতির প্রায় সকল দেশেই জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র রয়েছে। যেমন– যুক্তরাজ্যের National Film Center লন্ডন শহরের টেমস নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটেও রয়েছে অনুরূপ যাবতীয় সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন আরেকটি চলচ্চিত্র কেন্দ্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের San Francisco Film Center বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আরেকটি চলচ্চিত্র কেন্দ্র। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই রয়েছে অনুরূপ চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র। এসব দেশের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের আদলে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়ও গড়ে তোলা হয়েছে 'নন্দন ফিল্ম সেন্টার'। উল্লেখ্য, কলকাতা ভারতের 'সাংস্কৃতিক রাজধানী' হিসেবে খ্যাত। সাধারণত একটি দেশের রাজধানী শহরের কেন্দ্রে সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র বা 'জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র' গড়ে তোলা হয়, যার ফলে ঐ শহর তথা সারাদেশের মানুষের চলচ্চিত্র চর্চার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সমান সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ থেকে প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক জার্নাল ও গবেষণা গ্রন্থ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৮৭ সালের ৮ই অক্টোবর তথ্য মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট এক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে। গ্রুপের সদস্যবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'খসড়া জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ১৯৮৮' প্রণয়ন করেন এবং কমিটি ১৯৮৮ সালের শেষভাগেই তা সরকারের নিকট পেশ করে। ঐ প্রতিবেদনেও সুপারিশ করা হয়েছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ঢাকায় একটি চলচ্চিত্র কেন্দ্র গঠন করার কথা। প্রতিবেদনের আখ্যান ভাগে বলা হয়, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং জাতীয় অঙ্গনে এই মাধ্যমকে শ্রদ্ধাস্পদ করে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে। ওয়ার্কিং গ্রুপের এ প্রস্তাব ছিল যুক্তিসংগত এবং অত্যন্ত সময়োপযোগী। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭'-তেও জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নবনির্মিত বহুমাত্রিক ও অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন'

বস্তুত বাংলাদেশে অনুরূপ একটি জাতীয় চলচ্চিত্র

কেন্দ্র স্থাপন করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকার ঢাকা শহরের কেন্দ্রে 'সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয়' গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রস্তাবিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র' তার সাথে একটি অপরিহার্য ও পরিপূরক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত ও যুক্ত হতে পারে। কারণ ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে শাহবাগ অথবা রমনা এলাকা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ইনস্টিটিউট, পাবলিক লাইব্রেরি, জাতীয় জাদুঘর, শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি ও রমনা পার্কের সবুজ বেষ্টনী পরিবেষ্টিত মনোরম এলাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন কোনো স্থানে জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র স্থাপিত হলে সবাই উপকৃত হবে।

চলচ্চিত্র কেন্দ্রের কাজ

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্রের কাজ প্রসঙ্গে ১৯৮৮ সালের চলচ্চিত্র নীতিমালা সংক্রান্ত খসড়া ধারণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে– জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্রের কর্মসূচির মধ্যে থাকবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি এবং নিয়মিত ধ্রুপদী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। এছাড়া বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের কেন্দ্রও হবে এটি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের San Francisco Film Centre-এ চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল সুবিধার পাশাপাশি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য রয়েছে একটি বিশাল খোলা জায়গা। এখানে সরকারি-বেসরকারি বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, মিটিং, তহবিল সংগ্রহ, চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রশিক্ষণ, সম্মেলন এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

অপরপক্ষে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট (BFI)-এ চলচ্চিত্র উৎসব, প্রদর্শনী, প্রিমিয়ার ও প্রাক-প্রদর্শনী, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার, বিশেষ প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ কোর্স, গবেষণা এবং চলচ্চিত্র লাইব্রেরিতে অধ্যয়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন প্রোডাকশনের একটি বিশাল ডাটাবেজ গড়ে তোলা হয়েছে। গবেষণা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে এখানে ফিল্ম ফুটেজ বিক্রির ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এখান থেকে বিএফআই-এর প্রকাশনা ডাউনলোড করে এসব তথ্য-উপাত্ত গবেষণার কাজে ব্যবহার করা যায়। চলচ্চিত্রের নির্মাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী অন্যান্য সকল পেশার মানুষের ব্যাপক মতবিনিময়ের সুযোগ রয়েছে এখানে। এখান থেকে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রোডাকশনের তালিকাও সরবরাহ করা হয়। সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে পরিবারসহ শিশুদের জন্য সময় কাটানো, ছবি দেখা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় এবং স্থানীয় ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহের জন্য বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। রয়েছে প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স আয়োজনের সুযোগ। গণমাধ্যম ও মাল্টিমিডিয়াসহ চলচ্চিত্রের অন্যান্য পেশাগত ও বৃত্তিমূলক মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার পাশাপাশি ইংল্যান্ড, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলসের বাসিন্দাদের জন্য চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দূরশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয় এখানে। এছাড়া নীতিনির্ধারণী ও গবেষণা বিষয়ে পরামর্শক সেবা প্রদানের ব্যাপক সক্ষমতা রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের।

চলচ্চিত্র কেন্দ্রের অন্যতম কাজ চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন

'খসড়া চলচ্চিত্র নীতিমালা ১৯৮৮'-র সুপারিশ, ইতোমধ্যে চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রদর্শনের ফরমেটে সংঘটিত পরিবর্তন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের চলচ্চিত্র কেন্দ্রসমূহের দৃষ্টান্ত এবং বিগত দুই দশকে ডিজিটাল প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির বিষয় বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে একটি আধুনিক চলচ্চিত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে তার কাজ হতে পারে:

১. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, উন্নতমানের দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্রের নিয়মিত প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, রেট্রোসপেকটিভ ইত্যাদি আয়োজন ও ফেস্টিভাল অফিস পরিচালনা করা;
২. চলচ্চিত্র বিষয়ক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি, পুরস্কার প্রবর্তন ও বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করা;
৩. চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, আলোচনা, বিতর্ক, স্মরণোৎসব, দিবস, সপ্তাহ ইত্যাদি আয়োজন করা;
৪. চলচ্চিত্র অনুধাবন (Film Appreciation), নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ক্যাম্প ইত্যাদি আয়োজন করা;
৫. চলচ্চিত্রের নান্দনিক, কারিগরি, ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
৬. চলচ্চিত্র জার্নাল, গবেষণাপত্র, গ্রন্থ, অ্যালবাম, পত্রিকা, বুলেটিন, পোস্টার, ভিউকার্ড ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা;
৭. উন্নতমানের চলচ্চিত্র পাঠাগার (Film Library) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এবং ডাটাবেজ গড়ে তোলা;
৮. চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় পণ্যসামগ্রী সংবলিত বিপণন

কেন্দ্র (Souvenir shop) পরিচালনা করা;

৯. চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের বিকাশ, ফিল্ম ক্লাব ও সোসাইটি গঠন, স্টাডি গ্রুপ গঠন এবং পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

১০. সকল চলচ্চিত্রের নিবন্ধন ও পরিচিতি নম্বর বরাদ্দ এবং অনলাইনে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত তথ্যাদির আপডেট উপস্থাপন করা;

১১. চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের জীবনবৃত্তান্ত সংরক্ষণ এবং তাদের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১২. চলচ্চিত্র অধ্যয়ন, গবেষণা ও নির্মাণের জন্য ফেলোশিপ, অনুদান ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

১৩. সব ফরমেটের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুবিধা সংবলিত সিনেথিয়েটার/কমপ্লেক্স পরিচালনা করা;

১৪. চলচ্চিত্র জাদুঘর (Film Museum) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা (এতে চলচ্চিত্র শিল্পের বিবর্তনের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, উপকরণ, পুরাতন যন্ত্রপাতি, পরিমণ্ডল, প্রকাশনা, পোশাক, অলংকার, সেট, প্রতিকৃতি, পাণ্ডুলিপি, চিত্রনাট্য, ফুটেজ, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য, ব্যক্তির অবদান, স্মৃতিচিহ্ন, ইতিহাস ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে);

১৫. উন্নতমানের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ ও বিক্রির জন্য ক্যাফেটেরিয়া পরিচালনা করা;

১৬. চলচ্চিত্র দেখা, গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আদান-প্রদানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত ও দক্ষ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবস্থাসম্পন্ন সাইবার ক্যাফে পরিচালনা করা;

১৭. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে চলচ্চিত্রপাঠ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৮. শিশুদের চলচ্চিত্র সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য Children's Corner প্রতিষ্ঠা করা;

১৯. জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্রের সদস্যপদ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা;

২০. চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয়ে দূরশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা;

২১. বিবিধ;

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো

এ প্রসঙ্গে খসড়া জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালায় উল্লেখ আছে– রাজধানীর একটি উপযুক্ত পরিবেশসম্পন্ন এলাকায় একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করতে হবে। এতে থাকবে (ক) একটি ১৫০০ সিটের মাল্টি গেইজ প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা সংবলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফেস্টিভাল হল, (খ) ৩টি (১৫০, ২৫০ ও ৪০০ সিটের) প্রক্ষেপণ ও ভিডিও ব্যবস্থা সংবলিত হল, (গ) একটি রিসার্চ লাইব্রেরি হল, (ঘ) সেলফ সার্ভিস ক্যাফেটেরিয়া, (ঙ) জাতীয় চলচ্চিত্র পরিষদের দপ্তর এবং (চ) কেন্দ্রের নিজস্ব অফিস ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষসমূহ।

তবে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বলা যেতে পারে, একটি স্বশাসিত আধুনিক জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্রের অনুকূল পরিবেশ রচনা এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সৃষ্টি করতে একটি বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণসহ সম্ভাব্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য আনুমানিক ১ (এক) একর জমির প্রয়োজন হবে। এতে ১টি ১০০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, সিনেথিয়েটার, প্রজেকশন হল, সভাকক্ষ, সেমিনার/কনফারেন্স হল, ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন থিয়েটার, ফেস্টিভাল অফিস, ফিল্ম লাইব্রেরি, অফিস ব্লক, ফিল্ম মিউজিয়াম, রিসার্স জোন, চিলড্রেন'স কর্নার, ক্যাফেটেরিয়া, শুভেনির শপ, বেজমেন্ট ও পার্কিং সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

উল্লিখিত অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টির পাশাপাশি ভবনের পাশে পর্যাপ্ত উন্মুক্ত জায়গা রাখা, মাল্টিপ্লেক্সে আধুনিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও শক্তিশালী সার্ভার এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে কর্মকর্তাদের জন্য অফিস সংক্রান্ত যানবাহন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাঠামোগত ব্যবস্থা গড়ে তোলার।

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্রের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের সংস্থান রাখতে হবে। পদসমূহের সম্ভাব্য সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিরূপণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অতীতে এ সমস্ত ক্ষেত্রে সংগঠকদের অনেকেই নানা কারণে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

স্থান নির্ধারণ ও অর্থসংস্থান

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য জনসাধারণের মধ্যে সুস্থ চলচ্চিত্রের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া। তাই জনসাধারণের পছন্দ ও যাতায়াতের সুবিধাজনক স্থানে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদ, বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি পরিবেষ্টিত সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন কোনো স্থানে শাহ্বাগ অথবা রমনা অথবা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে প্রস্তাবিত জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রাথমিকভাবে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রতিবছর সরকারি বরাদ্দ, নিজস্ব আয়, অনুদান ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে এ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। যথাযথ আনুকূল্য ও পরিচর্যা পেলে জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান পৃথিবীর মানুষ ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে চলচ্চিত্রে মগ্ন। বিশ্বজুড়ে এখন চলচ্চিত্রের পরিমণ্ডলে যেমন ঘটছে অভূতপূর্ব অগ্রগতি, তেমনি নান্দনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অগ্রগতির এ ঢেউ বাংলাদেশের জীবন সমুদ্রের তটরেখায়ও আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশেও আমাদের সকলের জীবন ক্রমশ চলচ্চিত্রময় হয়ে উঠছে। এদেশের শিল্পসচেতন অনেক চলচ্চিত্রকার ও মননশীল দর্শকেরই পরিচয় ঘটেছে বিশ্বনন্দিত, জীবনঘনিষ্ট, ধ্রুপদী ও শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্রধারার সাথে। চলচ্চিত্রের চিরন্তন আবেদন ও ভাষা তাদেরকে করেছে অভিভূত, মোহিত ও তৃষ্ণার্ত। তারা আজ আত্মআবিষ্কারের সাধনায় বিভোর। তাছাড়া চলচ্চিত্র এখন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানেরও উৎস। দেশের বিপুল যুব সম্প্রদায়ও চলচ্চিত্রের প্রতি এখন দারুণভাবে আগ্রহান্বিত ও চলচ্চিত্রে নিবিষ্ট। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় এই সাংস্কৃতিক ধারাকে তাই আরো সমৃদ্ধ ও বেগবান করতে হবে। এজন্য চলচ্চিত্র শিল্পের সঠিক বিকাশে দেশে একটি 'জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র' গঠন অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মের সাংস্কৃতিক আগ্রহ বিবেচনায় নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে দেশে একটি 'জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা এখন অবশ্য কর্তব্য।

লেখক: কবি, লেখক ও গবেষক এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য অফিসার

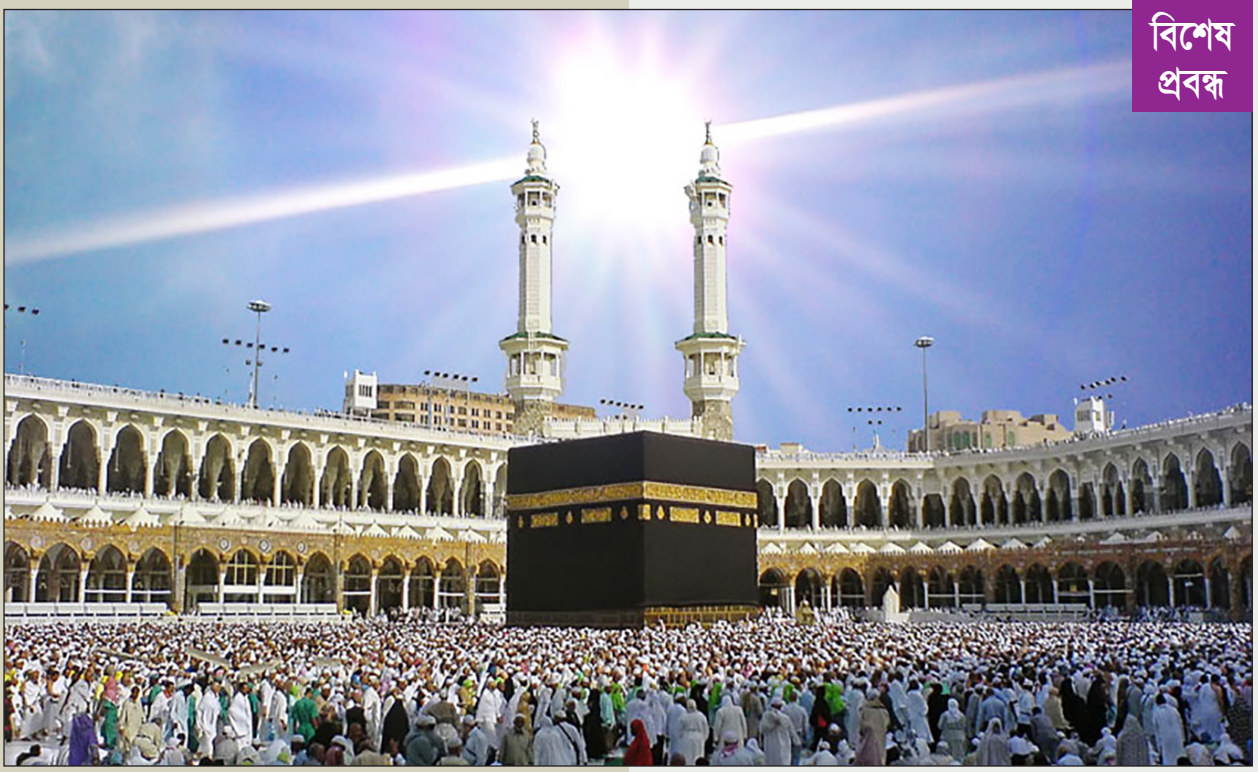

কাবাঘরে রমজানের ইতিকাফ এবারের অভিজ্ঞতা

ড. মোহাম্মদ হাননান

পবিত্র ঘর কাবায় রমজানে সুন্নতী ইতিকাফে অংশ নেব, এমন একটা আকাঙ্ক্ষা অনেকদিন ধরেই পোষণ করছিলাম। হঠাৎ একটা জামায়াত দাঁড়িয়ে গেল। তবে কেউ কেউ বাদ গেল ৪০ বছর বয়স না হওয়ার কারণে। এটাও একটা অভিজ্ঞতা যে, ৪০ বছর বয়স না হলে সৌদি আরব থেকে ওমরাহর ভিসা পাওয়া যায় না। তবে কাউকে যদি মা অথবা এমন কাউকে সাহায্য করতে যেতে হয়, যার তিনি মাহরাম, তাহলে ৪০ বছর না হলেও ভিসা পাওয়া যাবে।

আমি, ফউজুল আজিম, বদরুজ্জামান, নূর আহমেদ ও নাজমুর রহমান সেলিম ঠিক করলাম আমাদের সার্বক্ষণিক শরিয়তসম্মত পরিচালনার জন্য একজন আলেমকে আমরা নিয়ে যাব। এজন্য মোহাম্মদপুরের বসিলাস্থ মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া (ইসলামের উচ্চ গবেষণা কেন্দ্র) -এর পরিচালক মুফতি মাহমূদুল আমীনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি আজিমপুর কলোনির পার্টি হাউস জামে মসজিদের খতিবও। তিনি খুশি মনে রাজি হলেন। পাঠকের জন্য এটাও একটা অভিজ্ঞতা যে, হজ-ওমরাহ-ইতিকাফে সঙ্গী হিসেবে একজন আলেম থাকা চাই। এটা অনেকটা অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার মতো। যাদের সামর্থ্য আছে, তারা যেমন বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার সময় দেশের একজন ডাক্তার নিয়ে যান, এটা ঠিক তেমনই। রুহানি চিকিৎসার জন্যও সর্বক্ষণ চাই একজন আলেম। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে সাধারণ মানুষ হজ-ওমরায় যায়, কিন্তু মাসলা-মাসায়েলের ঘাটতির জন্য সহিভাবে তা অর্জন করতে পারে না। আমরা যে আমাদের সঙ্গে একজন আলেম নিয়ে গেলাম, ওমরাহ ও ইতিকাফের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এর ইতিবাচক দিকগুলো টের পেয়েছি। বিশেষ করে 'ইতিকাফ' বিষয়টা খুব সহজ না, আবার তা যদি হয় পবিত্র কাবাঘরে। কতখানি সতর্ক না থাকলে ইতিকাফ ভেঙে যেতে পারে তার সহি ব্যবহারটি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে আমরা মহান আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করেছি।

ওমরাহ-ইতিকাফে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই আমাদের এক সাথি বললেন, নবিজি সা.-কে সালাম দিয়ে আরবে ঢুকব, আবার সালাম দিয়ে আরব থেকে বাংলাদেশে আসব। ফলে এমন করে টিকিট কাটতে হলো যাতে প্রথমে মদিনাতেই নামতে পারি এবং আসার সময়ও মদিনা থেকেই প্লেনে উঠতে পারি। এটা হলো নবি সা.-এর সঙ্গে তাঁর উম্মতের ভালোবাসার সম্পর্ক। সে হিসেবে মদিনা মনোয়ারা থেকে আমরা ইতিকাফ শুরুর কয়েকদিন পূর্বেই মক্কায় পবিত্র কাবাঘরে হাজির হলাম। এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করলেন মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি তাঁর ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে কাজটি সহজ করে দিয়েছেন । তিনি আমাদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কাবাঘরে ইতিকাফ করতে হলে একুশ রোজার কয়েকদিন আগেই সেখানে পৌঁছাতে হবে। তা নাহলে জায়গা পাওয়া যাবে না। ফলে আমরা ইতিকাফ শুরুর কয়েকদিন আগেই সেখানে পৌঁছে গেলাম।

ঢাকা থেকে জেনে গিয়েছিলাম, কাবাঘরে ইতিকাফ করতে হলে আগে নাম নিবন্ধন করতে হয়। আমাদের আমির সাহেব (দলনেতা) মুফতি মাহমূদুল আমীন খুব ভালো আরবি জানেন। তিনি কাবাঘরের ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক কিছু বোঝা গেল না। নেট-এ নিবন্ধন করার একটি কথা শুনলাম, কিন্তু সেখানে দেখা গেল, এখন আর নিবন্ধন হচ্ছে না । অগত্যা আমরা অন্যান্য দেশের সাধারণ মুসলিমদের মতো কাবাঘরে প্রবেশ করে জায়নামাজ বিছিয়ে নিলাম। এখানে জায়নামাজ সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতা হলো, ইতিকাফের জন্য একটি জায়গাকে নির্দিষ্ট করতে হবে, কিন্তু জায়নামাজ বিছিয়ে কোথাও গেলে খালি দেখলে কাবাঘরের পুলিশ এ জায়নামাজ নিয়ে যাবে। সুতরাং সাবধানে থাকতে হবে। আবার জায়নামাজ পাতা না থাকলে অন্য কেউ এসে সেখানে বসে যাবে। এ

জন্য নিজেদের একটা জামায়াত থাকতে হবে, যাতে তাওয়াফ বা অন্য কোনো জরুরত–অজু, এস্তেনজা সারতে বাইরে গেলে অন্যরা এটা সুরক্ষা করতে পারে। কাবাঘর সকল মুসলিম জাহানের, সকলেরই অধিকার আছে এখানে ইতিকাফ করার, সুতরাং ঝগড়াঝাটিও করা যাবে না, কাউকে কষ্ট দিয়ে কাবাঘরে থাকা যাবে না।

সময়গুলো যাতে আমলের মধ্যে কাটে তার জন্য সচেতন থাকা জরুরি। মুফতি সাহেব আমাদের এজন্য সবসময় আমলের মধ্যে রাখতেন। মাঝেমাঝেই মোজাকারা (আমলের আলোচনা) করতেন। তিনি একদিন মোজাকারায় বললেন, আমল করতে হবে এহতেসাবকে সামনে রেখে । এহতেসাব হলো 'লাভ'। আমল করলে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন হবে, এটা হলো সবচেয়ে বড়ো লাভ। যখন আমরা এ ইতিকাফ করি তখন যেন মোরাকাবা করি। চোখ বুজে চিন্তা করি, নিজের মৃত্যুর দৃশ্য কল্পনা করি। তাওয়াফ করতে করতেও মোরাকাবা করা যায়। মক্কার লু (গরম হাওয়া)-র সঙ্গে হাশরের ময়দানের গরমের আরো ভয়াবহতা কল্পনায় আনা যায়।

আল্লাহর ঘরে বায়তুল্লাহয় বসে দেশের খবর, বিষয়-সম্পদের খোঁজ নেওয়া ঠিক না । মুফতি সাহেব বললেন, এর চেয়ে ভালো–দেশে থেকে, মাল-সম্পদের মধ্যে থেকে, বায়তুল্লাহর খবর রাখা, বায়তুল্লাহর জন্য ভালোবাসা দেখানো ।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিকাফ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আপনাকে এ বিষয়ে পূর্বে থেকেই সচেতন থাকতে হবে। সুন্নত হিসেবে ঔষধ তো খাব, কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য ঔষধের ওপর একিন করা যাবে না। অসুস্থতা আল্লাহ দেন পরীক্ষা করার জন্য। অসুস্থ অবস্থায় বান্দা আল্লাহর প্রতি খুশি আছেন কি না আল্লাহ তা দেখতে চান। অসুস্থতায় পেরেশান, হায়-হুতাশ হলে, বুঝতে হবে এ অসুস্থতা আজাবের।

কাবাঘরে সবচেয়ে দামি আমল হলো বেশি বেশি তাওয়াফ করা। রমজান মাসে দিনের বেলা তাওয়াফ করা কঠিন হয়, তাই রাতেই তাওয়াফ সহজ। কিন্তু রাতে রয়েছে তারাবি নামাজ ও কিয়ামুল লাইল। আলেমগণ আমাদের বললেন, দেশে ফিরে গিয়ে কিয়ামুল লাইল করা যাবে। কিন্তু তাওয়াফ করা যাবে না। তাই কাবাঘরে ইতিকাফের দিনগুলোতে বেশি বেশি তাওয়াফ করা চাই। আমরা এ কথা অনুসরণ করলাম।

মুফতি সাহেব একদিন মোজাকারা করতে গিয়ে বললেন, বায়তুল্লাহ এবং সকল মসজিদ মানবজাতির বাবার স্মৃতিতে ভরপুর। বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন, বায়তুল্লাহ অর্থাৎ কাবাঘর তৈরি করতে জান্নাত থেকে পাথর পাঠানো হয়েছিল। তৈরি শেষে আল্লাহ তায়ালা অতিরিক্ত পাথর সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা সমুদ্রে, জঙ্গলে ও বিভিন্ন জনপদে পড়েছে। যেখানে একটা পাথর পড়েছে সেখানে একটা মসজিদ হবেই। সকল মসজিদেই তাই জান্নাতের পাথর রয়েছে। জান্নাত হলো মানবজাতির বাবার বাড়ি। মানবপিতা দুনিয়ায় জান্নাত থেকে এসেছিলেন। সেই জান্নাতের পাথর সকল মসজিদে থাকায় মসজিদ তাই সকল মানুষেরই বাবার বাড়ির স্মৃতিতে ভরপুর। মসজিদে গিয়েই মানুষকে তাই তৃপ্তি পেতে হবে। অনেক মুমিন তাই মসজিদেই বেশি আনন্দ লাভ করে।

জামাতুল বিদার দিনে জুম্মার খুতবায় কাবাঘরের খতিব যে ভাষণ দিলেন, তাতে তিনি রসুল পাক সা.-কে উদ্ধৃত করে বললেন, আমলের শেষটুকু গুরুত্বপূর্ণ। শেষটা যার ভালো হবে সে সফল, শেষ পরিণতির ওপরই ফলাফল। রোজাগুলো যেন সুন্দর হয়, ওজনদার হয় তার জন্য সকলকে তাগিদ দেওয়া হলো। রোজাদারের আনন্দ ইফতার ও ঈদের দিনে। ইতিকাফের দিনগুলোতে আমরা আরবদের মেহমানদারিতে ভরপুর থেকেছি। প্রতিদিন বাইরে থেকে কাবাঘরের লক্ষ লক্ষ ইতিকাফকারীকে ইফতার করানো হয়। আরবের প্রধান খাদ্য খেজুরই ইফতারির প্রধান আকর্ষণ। তবে রুটি, লাবান (মাঠা), পনির, মাখন ইত্যাদিও থাকত।

আমাদের বাংলাদেশের ইতিকাফকারীদের খুব পছন্দ করেছিলেন মক্কার কোনো এক মসজিদের ইমাম। তিনি আমাদের পাশেই ইতিকাফ করছিলেন। একদিন বললেন, তোমাদের দলের সবাইকে আমি প্রতিদিন রাতের খাবার মেহমানদারি করাব। আমরা বললাম, আমাদের কেউ প্রতিদিন খাবার দিয়ে যাবে এভাবে আমরা ব্যবস্থা রেখেছি। তিনি বললেন, তাহলে এর সবটা খরচ বহন করব। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে হার মানতেই হলো। আফ্রিকার হাবশার বাহার, সে কাবাঘরে অবস্থিত মাদরাসার ছাত্র। আমাদের খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। আমাদের খাওয়ানোর উৎসাহ থেকে তাকেও ফেরানো গেল না। আলজিরিয়ার যুবক আহমাদ, লিবিয়ার প্রকৌশলী আবদুল্লাহ তাদের নিজ নিজ দেশের রেসিপি আমাদের খাইয়ে ছেড়েছে। এগুলো উল্লেখ করলাম এজন্য যে, সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম যে একটি শরীর ইতিকাফের দিনগুলোতে তা খুব অনুভব করেছি।

এর আগে ২০০৭ এবং ২০০৮-এ আমি সস্ত্রীক হজ করেছি। দুবারই আমি মক্কার কুরাইশদের খুঁজেছি। একটি হাদিস থেকে জেনেছিলাম, নবি সা. বলেছেন, তোমরা যখন হজ করবে তখন কুরাইশদের দান করবে। এবার আমাদের মুফতি সাহেব মক্কার ইতিকাফকারীদের বলে রাখলেন, যদি কাবাঘরে কোনো কুরাইশ দেখতে পাও তাহলে আমাদের খবর দিও। একদিন সত্যি সত্যি আমাদের পাশেই এক কুরাইশ এসে হাজির । মক্কাবাসী বললেন, 'এই তোমরা কুরাইশ খুঁজতেছিলে', আমার বাম পাশে এই মুহূর্তে যিনি বসে আছেন তিনি কুরাইশ'। তবে সতর্ক করে দিলেন, সাবধানে কথা বলো, তিনি কিন্তু নবি সা.-এর বংশধর। আমরা আরজ করলাম, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা তাঁকে কিছু সামান্য হাদিয়া দিতে চাই। তিনি নেবেন কি-না। তিনি কথা বলে আমাদের জানালেন, 'তিনি খুশি মনেই তা গ্রহণ করবেন'। আমরা তাঁর কাছে হাদিয়া পেশ করলাম। তিনি খুব খুশি হলেন। আমাদেরও হাদিয়া দিলেন। জানলাম, তিনি ফাতেমা রা.-এর বড়ো সন্তান ইমাম হাসান রা.-এর বংশধর। তাঁর নাম সা'দ ইবনে হাম্মাদ আল-কুরাইশী। আমাদের সঙ্গে নিজে থেকেই কোলাকুলি করলেন। আমরা সবাই খুব তৃপ্তি পেলাম।

মদিনায় নবিজি সা.-কে সালাম করে মক্কায় ইতিকাফ করতে গিয়েছিলাম, আবার ইতিকাফ ও ঈদ শেষে মদিনায় ফিরে আসলাম। নবিজি সা.-কে সালাম দিয়ে দেশে ফিরে আসব। সাহাবি হাসান বিন ছাবেত রা.-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন মুফতি মাহমূদুল আমীন সাহেব। এ সাহাবি যখন নবি সা.-কে প্রথম দেখেছিলেন, তখন অস্ফুট স্বরে নবি সা.-কে বলেছিলেন,

> 'আপনার চেয়ে সুন্দর মানুষকে আমার চোখ দেখেনি। আপনার চেয়ে সুন্দর কোনো মানুষকে কোনো মা জন্ম দেয়নি। আপনি সকল দোষ-ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছেন। যেন আপনি যেমন চেয়েছেন তেমনি সৃষ্টি হয়েছেন।

নবি সা.-এর রওজা মোবারক জেয়ারত করতে করতে আমাদেরও সে কথা মনে হলো। তবে এখানে বেশি আবেগ দেখালে চলবে না । মুফতি সাহেব পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, আল্লাহর জন্য পাগল হয়ো, কিন্তু নবিজি সা.-এর ব্যাপারে সমঝে চলো। কোনো বেয়াদবি যেন না হয়ে যায়। কম্পিত পদ তাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে।

লেখক : লেখক ও গবেষক, মেইল : drhannapp@yahoo.com

উন্নয়ন ও সাফল্যের মহাসড়কে তথ্য মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত *রূপকল্প-২০২১* ও *রূপকল্প-২০৪১* বাস্তবায়নে গণতন্ত্রের বিকাশ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় নিরলস ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণসহ জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্কিংয়ের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে সামিল করা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০ উদ্যোগের এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট *(SDG)* অর্জনে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এ মন্ত্রণালয়।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) বিধিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১লা জুলাই ২০০৯ 'তথ্য কমিশন' গঠন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য সকল জেলা ও বিভিন্ন উপজেলায় অবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ওয়েবসাইট ভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী ও এনজিও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন করা হচ্ছে।

গণমাধ্যমকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করতে এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০১০', বেসরকারি মালিকানায় 'এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান নিয়মাবলি ২০১২ (সংশোধিত), যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা ২০১২ (সংশোধিত), বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা ২০০৮-এর সংশোধন ২০১০ (বিজ্ঞাপনের হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০% বৃদ্ধি করা হয়) সহ বেশ কয়েকটি নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল (সংশোধন) আইন ২০১৬-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা ২০১২-এর আওতায় ৮১৯ জন সাংবাদিক/সাংবাদিক পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪ এবং সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন এবং এর আওতায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। ট্রাস্ট তহবিলে ৫ কোটি টাকার সিড মানি, ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার অনুদান এবং ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট *(PIB)*-এ অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো ১৯৬ জন দুস্থ, অসচ্ছল, দুর্ঘটনায় আহত ও মৃত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের মাঝে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

বিগত সাড়ে ৮ বছরে বেসরকারিখাতে ৪৪টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল, ২৪টি এফএম বেতার কেন্দ্র ও ৩২টি কমিউনিটির রেডিও'র লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২১টি এফএম বেতার কেন্দ্র ও ১৭টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৩২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫শে জানুয়ারি ২০১১ সালে 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' নামে একটি পৃথক চ্যানেল চালু করা হয়। গত ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৬ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৬ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবাদপত্র বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ১,৭৬৪টি নতুন পত্রিকার নামের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। সারাদেশে ১১২৬টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এবং তথ্য অধিদফতরে অনলাইন গণমাধ্যমের নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ বেতারের প্রতিদিন সম্প্রচার সময় ২৪০ ঘণ্টা থেকে ৩৮৫ ঘণ্টায় উন্নীত করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' ঘোষণা করা হয় এবং ৩রা এপ্রিলকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' ঘোষণা করা হয়। বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণে সহযোগিতার জন্য প্রি-ফিল্ম মঞ্জুরি নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অনুদান ৩৫ লক্ষ টাকা থেকে ৬০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং ২৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ থেকে প্রতি অর্থবছরে ২টি করে শিশুতোষ (১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও ১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য) চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। সরকারি অনুদানে বিদ্যমান প্রেক্ষাগৃহসমূহ ডিজিটালাইজ করা এবং বেসরকারি মালিকানাধীন প্রেক্ষাগৃহসমূহের উন্নয়ন, প্রেক্ষাগৃহে ডিজিটাল চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও সাউন্ড সিস্টেম চালুর জন্য সরকারি অনুদান নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। চলচ্চিত্র সংসদ/ক্লাব নিবন্ধন ও পরিচালনার জন্য *The Film clubs (Registration and Regulation) Act 1980* রহিত করে 'চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন ২০১১' প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ১লা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই আগস্ট ২০১৫ সার্কিট হাউজ রোডে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে তথ্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মোনাজাত করেন। এ সময় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

নভেম্বর ২০১৩ তারিখে কার্যক্রম শুরু করেছে। ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ইনস্টিটিউটে প্রথম 'চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা)' কোর্স উদ্‌বোধন করেন। ইনস্টিটিউটের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে জমি সংগ্রহ করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র তৈরির সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সজ্জিত করার কাজ চলছে। ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কবিরপুরে 'বঙ্গবন্ধু ফিল্মসিটি' স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে এবং ৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিএফডিসি আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ' কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ সেন্সর করার জন্য বিদ্যমান সেন্সর নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের কাজ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সর্বমোট ৬৭২টি চলচ্চিত্রকে সেন্সর সনদপত্র প্রদান করেছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা মূল্যমানের আজীবন সম্মাননা এবং পোশাক ও সাজসজ্জা নামক দুটি নতুন ক্যাটাগরি প্রবর্তন করা হয়। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকের ক্ষেত্রে সম্মানী ১০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০ হাজার টাকা এবং শিল্পী ও কলাকুশলীদের ক্ষেত্রে সম্মানী ৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০০৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মোট ২১০টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৪টি দপ্তরের মধ্যে ১১২.৮০ লক্ষ টাকায় *EMTAP* কর্মসূচির আওতায় তথ্য অধিদপ্তরে '*Strengthening Development Communication between Government and Stakeholders'* শীর্ষক প্রকল্প, ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতারের ধামরাইস্থ পুরাতন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের বিকল্প হিসেবে একই শক্তিসম্পন্ন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন, ২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (প্রথম পর্যায়), ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিটিভি সদর দপ্তর ভবন এবং ৫৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত), ৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনসহ চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়াও 'পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম ও ২য় পর্যায়); এবং 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ (১ম ও ২য় পর্যায়)'শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে পিআইবিতে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কমপ্লেক্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

৮৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' ভবন নির্মাণ এবং ৮৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ কমপ্লেক্সকে ঢাকার আগারগাঁওয়ে স্থানান্তর, নির্মাণ, ও আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৭৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ ২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন এবং ৯৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা (সংশোধিত) ব্যয়ে 'তথ্য ভবন' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। একই ছাদের নিচে গণযোগাযোগ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের গণযোগাযোগ কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে 'তথ্য ভবন' নির্মাণ করা হচ্ছে। ১২ই আগস্ট ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এটুআই-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)- এ 'মিডিয়া ক্যাম্পেইন ফর আউটকাম অব এটুআই প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে অন্যান্য চলমান প্রকল্পের মধ্যে বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেটে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিটিভির টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন, বিটিভির সেন্ট্রাল সিস্টেম অটোমেশন, বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রচার কার্যক্রম সম্প্রসারণ (দ্বিতীয় পর্যায়) এবং প্রতিটি জেলার তথ্য অফিসসমূহের আধুনিকীকরণ এর অংশ হিসেবে ২৫টি জেলা তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ অন্যতম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগের ব্র্যান্ডিং বিষয়ে জনগণকে অবহিতকরণের জন্য আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী তৈরি, প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০টি উদ্যোগের ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন এ পর্যন্ত মোট ৩০টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান নির্মাণ করেছে। প্রামাণ্য অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার, থিম সং তৈরি ও প্রচার, নিয়মিত ফিলার প্রচার করা হচ্ছে। বেসরকারি টিভির মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতি সপ্তাহে 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' শিরোনামে ১৫ মিনিটের বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের প্রকল্প পরিচালকগণসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। জেলা, উপজেলায় স্থানীয় জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে ৬২টি 'বহিরাঙ্গন' অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানসমূহের তথ্য, অডিও, ভিডিও চিত্র সরাসরি ধারণপূর্বক স্ব স্ব কেন্দ্রের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ ফেসবুকে আপলোড করার মাধ্যমে বহুমাত্রিক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৮টি দপ্তর বা সংস্থার অনুকূলে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। এর ফলে উদ্যোগসমূহ সফল করতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টারসহ নানাবিধ প্রচার কার্যক্রম।

সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গিবাদ বিরোধী জনমত গঠনের লক্ষ্যে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সাতটি বিভাগে সুধী সমাবেশ ও সভা অনুষ্ঠানসহ জেলা তথ্য অফিসমূহের উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুজব ও আতঙ্ক ছড়ানোর বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও তথ্য অধিদফতর প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'বাড়িভাড়া প্রদানে সতর্কতা' ও 'সন্তানের গতিবিধির ওপর মায়ের নজর রাখা' শিরোনামে ২টি টিভিসি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও বিদেশি সাংবাদিকদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের ওপর প্রামাণ্যচিত্র 'বাংলার মাটি বাংলার জল', বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র ওপর নির্মিত 'অসমাপ্ত মহাকাব্য'সহ মোট ১৩৬টি প্রামাণ্যচিত্র, ১৪৪টি সংবাদ চিত্র ও ৭২টি বিশেষ সংবাদচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে এই অধিদপ্তর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'কাঙাল হরিনাথ' জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১১ এবং 'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি' জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫ লাভ করেছে। 'ডিজিটাল প্রোডাকশন অব ডকুমেন্টারি অ্যান্ড ফিচার ফিল্মস' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ায় এই অধিদপ্তরটি সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মাণে সক্ষম হবে। ভিভিআইপিগণের দৈনন্দিন কার্যক্রম ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথমবারের মতো প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফিক ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুরূপ আরো ২টি ক্যামেরা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জনগণকে অবহিত করার জন্য *সচিত্র বাংলাদেশ* ও কিশোর পত্রিকা *নবারুণ* নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির জন্য ইংরেজি ত্রৈমাসিক *বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি* এবং প্রামাণ্যচিত্রসমূহ ইংরেজি ধারাভাষ্যসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিদেশ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হচ্ছে। দেশের পর্যটন বিকাশে বিভাগ ভিত্তিক পর্যটনের ওপর গ্রন্থ প্রকাশ করা অব্যাহত আছে।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি উদ্যোগ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

লেখক: মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

ত্যাগের মহিমায় ঈদুল আজহা

ম. মীজানুর রহমান

ইসলাম শান্তির, সাম্যের ও ত্যাগের ধর্ম, সম্পূর্ণ ভোগের নয়। এমন এক সত্য, সুন্দর ও সাম্যের মানবিক ধর্ম প্রবর্তন করে গেছেন হজরত মোহাম্মদ (স.), যার চিরন্তনতাকে নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ তিনি রেখে যাননি। ইসলাম অর্থাৎ শান্তি, যার প্রয়াসে আমাদের জীবনচেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে হয় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত। ঈদুল আজহা সেই পবিত্র ত্যাগের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

আমাদের আদি পিতা হজরত ইব্রাহিম (আ.) স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন তাঁর সবচেয়ে আপনজনকে কোরবানির (বলিদানের) জন্য আর তা ছিল তাঁর সবচেয়ে স্নেহের পুত্রধন হজরত ইসমাইল (আ.)। এটি আদৌ কোনো সাধারণ বিষয় নয়। হজরত ইব্রাহিম (আ.) এতই আল্লাহ-প্রেমে বিভোর ছিলেন যে, তিনি ঠিক পরদিনই খোদার আদেশমাফিক প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কোরবানি দিতে উদ্যত হলে ঠিক সেইখানে একটি দুম্বা এসে যায় অলৌকিকভাবে। তিনি তাঁর আল্লাহ-প্রেমে জয়ী হয়েছিলেন। সংক্ষিপ্তাকারে বড় ত্যাগের ধারাবাহিকতার জেরই হচ্ছে প্রতিবছরে আল্লাহর নামে কোরবানি দেওয়ার প্রথা। এটি কোনো লোক দেখানো কোরবানি নয়, এটি হচ্ছে ত্যাগের মাহাত্ম্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

যুগে যুগে মানুষের ওপর মানুষরূপী অমানুষদের যে অত্যাচার-অবিচার নিষ্পেষণ চলছে তার বিরুদ্ধে এবং নিজেকে ঋপুর তাড়নার বিরুদ্ধে শুভ ইচ্ছাকে বিজয়ী করার অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায় ঈদুল আজহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।

আজকের বড়ো শিক্ষা হচ্ছে বনের পশুকে কোরবানি দিয়ে আপন মনের পশুকে উৎখাত করে মনকে শুদ্ধ কর এবং আত্ম-মুক্তির চেতনাকে জাগিয়ে দাও, স্বজন মানব-হত্যা চিরতরে বন্ধ কর আর এটাই হচ্ছে ইসলামের আত্মোৎসর্গের অমোঘ শিক্ষা। ত্যাগের মহান শিক্ষা যদি আমাদের সকলের মজ্জাগত হয় এবং আমরা যদি মহাভোগবাদকে পরিহার করতে শিখি ইসলামি আদর্শে তাহলে আমাদের সকলের জীবন হবে সুখী ও সমৃদ্ধ এবং মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা হবে সংঘাতমুক্ত, সর্বস্বার্থ-বিযুক্ত অক্ষয়।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন অনন্য কারিগর। আর এ কথার মধ্যে আদৌ কোনো অত্যুক্তি আছে বলে কেউই যুক্তি দিতে পারবে না। আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পৃক্ত দৃশ্যাবলি হয় আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে, নয় মানুষের সাধের পরিচর্যায় অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে বা হচ্ছে, তার মূল করিৎকর্মা যিনি অদৃশ্যে বা আমাদের চোখের বাইরে নির্মাণোত্তর কলকাঠি নাড়ছেন, তাঁকে কে অস্বীকার করতে পারে। আর আমাদের সকল জ্ঞানের উৎসই তো হচ্ছেন তিনি। কেবল আপন সত্তাকে উপলব্ধি করলে এর উত্তর সহসাই মিলে যায়।

মানুষের যত শিক্ষা সব প্রকৃতির আদলে। তার খাওয়া, পরা, বেঁচে থাকা, জীবনধারণ– সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রকৃতি-নির্ভর। এই নির্ভরতা থেকে কারোরই মুক্তি নেই। তাই আজ মানুষ প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে দূষণমুক্ত রাখতে বড়ো উদগ্রীব। কালক্রমে মানুষ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারে জীবনের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে রেখেছে অব্যাহত আর তার পেছনে রয়েছে অমিত কারিগরি কৌশল। তার চোখে স্পষ্টত এখন আবহাওয়া মণ্ডলের পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। এর ফলে তার কৌশলগত প্রযুক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে নতুন পথ আবিষ্কারে মনোযোগী হতে হয়েছে। অতি আদিকাল থেকেই কারিগরি প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মানুষ, তবে তার গুণগত ক্রমবিকাশ ঘটে আসছে মাত্র। প্রস্তর যুগ কিংবা নৃতত্ত্ব যাই-ই বিশ্লেষণ করা যাক না কেন, এটাই কালে কালে ঘটে আসছে। এই বিজ্ঞান এই কারিগরি প্রযুক্তি হলো সবই মানব-কল্যাণের।

কিন্তু বড়ো দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় যে, মানুষের মধ্যেই জন্মেছে অনেক অমানুষ যারা বিজ্ঞান–কারিগরি প্রযুক্তিকে সামান্য আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে অপব্যবহার করছে, মানুষ হত্যার পাঁয়তারা করছে, আপন শক্তির দম্ভতে আত্মহারা হয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে অসংখ্য আপামর নিরীহ জনসাধারণকে বিনাশ করছে, জনগণের সকল ধনসম্পদ ধ্বংস করে দিচ্ছে অথবা কৌশলে আত্মসাৎ করছে আর পুঁজির পাহাড় গড়ছে। এইসব অমানুষদের বিরুদ্ধেও প্রকৃত মানুষের কালজয়ী সংগ্রাম থাক নিরন্তর। শান্তির পতাকাবাহী প্রতিটি মানব যোদ্ধা হোক, সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদী শয়তান অমানুষদের হঠিয়ে দিক, প্রতিষ্ঠা করুক বিশ্ব শান্তি। শান্তির আলোয় হোক উদ্ভাসিত আমাদের শান্তিবাদী প্রতিটি ঘর। আমাদের সংঘবদ্ধ কারিগরি প্রচেষ্টায় মানব-শত্রু নিপাত যাক আর ঘরে ঘরে আসুক শান্তি আর স্বস্তি...। মানুষ মানুষকে ভালোবাসুক যুগ যুগ ধরে। হিংসা আর স্বার্থপরতা দূর হোক মানুষের মন থেকে, ঘুচে যাক সকল অজ্ঞতার অন্ধকার। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাক সবখানে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে, সংগীতে ও গীতে আজীবন সত্য, সুন্দর ও সাম্যের প্রবক্তা ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে ও গানে স্থান পেয়েছে ইসলামের সেই আত্মশক্তির আহ্বান এবং সকল অশান্তি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি সকল প্রকার অমানবিকতার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ এবং সর্বত্র ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কোরবানী'তে সেই নির্দেশনা ভাস্বর হয়ে আমাদের সামনে জাজ্বল্যমান। প্রসঙ্গত বলতে হয়, তাঁর যুগটি ছিল পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশি দুঃশাসন আর ছিল সেই শাসনানুগ অত্যাচার আর অবিচার, যার বিরুদ্ধে তিনি চেয়েছিলেন আত্ম শক্তির উদ্‌বোধন। আর সেই দুঃশাসনের, সেই অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ (জান-কোরবান)। তাই তিনি বলেছেন,

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।
দুর্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন।
ধ্বনি ওঠে রণি' দূর বাণীর,–
আজিকার এ খুন কোরবানীর!...

পশু কোরবানি দিয়ে পশু শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছেন কবি। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পাশাপাশি নিজের অশুভ ইচ্ছা এবং অন্যায় ও অর্থনৈতিক কর্ম ত্যাগ করার শিক্ষাই হলো কোরবানী বা ঈদুল আজহার প্রকৃত শিক্ষা।

লেখক: কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে আয়কর, আয়কর মেলা ও রাজস্বের ভূমিকা

এম এ খালেক

রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। সরকারকে নানাভাবে এই অর্থের জোগান দেওয়া হয়। সাধারণত দু'ভাবে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান করা এবং দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। আন্তর্জাতিক উৎস বলতে বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থাগুলোর নিকট থেকে সাহায্য অথবা অনুদান এবং ঋণ গ্রহণ করাকে বুঝানো হয়। কিন্তু সময়ের বাস্তবতায় বর্তমানে বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সত্যি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ চাইলেই এখন আর বিদেশ সূত্র থেকে অনুদান বা সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। ঋণ পাওয়া গেলেও তার সুদের হার অত্যন্ত বেশি এবং শর্তাদিও খুব কঠিন। তাই বেশির ভাগ দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো পারতপক্ষে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে চায় না। বরং নিজস্ব উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। এ ছাড়া দিনের পর দিন বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের উপর নির্ভর করে থাকাটা কোনোভাবেই একটি দেশের জন্য মর্যাদাকর নয়। কারণ অতিমাত্রায় বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ নির্ভর একটি দেশের মর্যাদা থাকে না। তাই প্রতিটি দেশই চেষ্টা করে কীভাবে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ নির্ভরতা কাটিয়ে উঠা যায়। আমরা যদি বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখব স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ পেয়েছে আস্তে আস্তে তা কমে এসেছে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। দেশ যখন সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক দল বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করলে দেশ আবারো পিছিয়ে পড়ে। এরপর দীর্ঘ ১৫ বছরের সামরিক শাসনে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শুরু হয় লুটপাটের রাজনীতি। একজন সামরিক শাসক বলেছিলেন, 'মানি ইজ নট এ প্রোবলেম।' কিন্তু তাদের শাসনামলে জনগণ দেখেছে, মানি ইজ রিয়েলি এ প্রোবলেম। সামরিক শাসনামলে দেশ ক্রমশ বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর হয়ে পড়ে। বিশেষ করে '৮০ দশকে দেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণনির্ভর হয়ে পড়ে। সেই সময় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৯৮ শতাংশ অর্থায়ন করা হতো বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণ থেকে। দেশ এতটা বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর হয়ে পড়ার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়। এক পর্যায়ে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ১০০ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে এসেছিল। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ আবারো অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মাঝারি আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের কাছ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্তিতে দেশকে দাঁড় করানো। পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে যখন বিশ্বব্যাংক নাটক সাজানোর চেষ্টা করেছিল তখন সরকার ঘোষণা করেছিল যে, বিশ্ব ব্যাংক থেকে সাহায্য এনে নয়, নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। পদ্মা সেতু প্রকল্প এখন আর কোনো অলীক স্বপ্ন নয়। এটি একটি জ্বলন্ত বাস্তবতা। সে দিনের বাংলাদেশ সরকারের সেই সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছিল। তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছে। এটা সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের সঠিক অর্থনৈতিক নীতি ও পলিসির কারণেই। বাংলাদেশ এখন এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যেখানে একটি দেশ ইচ্ছে করলেই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করেই উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। অনেক দিন ধরেই বাংলাদেশ রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক রিজার্ভ সংরক্ষণ করে চলেছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ সার্ক দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। একমাত্র ভারত এ ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। একটি দেশের তিন মাসের রপ্তানি ব্যয় মেটানোর মতো অর্থ রিজার্ভে থাকলেই তাকে সন্তোষজনক বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে বর্তমানে যে রিজার্ভ রয়েছে তা দিয়ে ৯ মাসের রপ্তানি ব্যয় মেটানো যেতে পারে। এ সবই সম্ভব হয়েছে সরকারের যুগান্তকারী এবং যুগোপযোগী অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমের ফলে।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১লা নভেম্বর ২০১৬ আয়কর মেলার উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

কোনো মর্যাদাবান সরকার তার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অনন্তকাল বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার এই সত্যটি উপলব্ধি করেই স্থানীয় এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে

অর্থ সংগ্রহের উপর বিশেষ জোর দিয়ে চলেছে। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয়, সরকার নানামুখী সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে এখনো আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। তবে চেষ্টার কোনো কমতি নেই। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো। সরকার নানাভাবে রাজস্ব বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনো আমাদের দেশের রাজস্ব আদায়ের হার তুলনামূলকভাবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর চেয়ে কম। বাংলাদেশের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও বর্তমানে ১০ দশমিক ৩ শতাংশ। বিশ্বের সবচেয়ে কম ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও সংবলিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এমন কি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়েও বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর অধিকাংশেরই ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও ২০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। এমন কি সার্ক দেশগুলোর ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও আমাদের চেয়ে বেশি। যেমন–ভারতের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ। নেপালের ক্ষেত্রে এটা ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ। পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে এটা যথাক্রমে ১০ দশমিক ৬ শতাংশ ও ১২ দশমিক ৪ শতাংশ। সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ঠ সচেতন রয়েছে। গত অর্থবছরের জন্য বাজেট উপস্থাপনকালে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছিলেন, ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও ১৫ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। একই সঙ্গে ১২ লাখ করদাতার সঙ্গে আরো ৩ লাখ নতুন করদাতাকে যুক্ত করা হবে। গত এক বছরের ব্যবধানে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নাম্বার (ইটিআইএন) ধারীর সংখ্যা ছিল গত ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত ২৮ লাখ। আয়কর রিটার্ন দাখিলকারীর সংখ্যা ১৫ লাখ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দেশে ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও ছিল ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এটা ৯ দশমিক ২৯ শতাংশে এবং গত অর্থবছরে তা ১০ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। তবে এতে সন্তুষ্ট বা আত্মতুষ্টি লাভের কোনো সুযোগ নেই। কারণ আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে।

চলতি অর্থ বছরের জন্য যে বাজেট পাস করা হয়েছে তাতে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৮৭ হাজার ৯৯১ কোটি টাকা। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের এই লক্ষ্যমাত্রা সংশোধিত হতে পারে। কারণ নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা আগামী ২ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবার কারণে চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২০ হাজার কোটি টাকা কম হবার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আগের অর্থবছরে (২০১৬-১৭) রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লাখ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা। বর্তমানে আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থায় পরোক্ষ করের পরিমাণ বেশি। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্রত্যক্ষ কর থেকে আদায় করা হবে। আগামী ২ বছর পর নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ নিশ্চিতভাবেই অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়িত হলে সবার জন্য একই হারে অর্থাৎ ১৫ শতাংশ করে ভ্যাট আরোপ করা হবে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনাগুলো খুঁজে বের করতে হবে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ হয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদের সঙ্গে। তিনি বলেন, রাজস্ব আদায় হতে পারে এমন অনেক খাত এখনো কর জালের বাইরে রয়ে গেছে। এগুলোকে পরিকল্পিতভাবে কর জালের আওতায় আনা গেলে রাজস্ব আদায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেতে পারে। তিনি বলেন, কর আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে কিনা তা জানতে হলে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে করের খাত এবং করদাতার সংখ্যা বেড়েছে কিনা? যদি আমরা নতুন নতুন করদাতাকে কর জালের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি এবং কর আদায়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে পারি তাহলেই কেবল কর আদায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়তে পারে। করদাতার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি চাকরিজীবীদের কর জালের মধ্যে নিয়ে আসার ফলে অনেকটা হঠাৎ করেই টিআইএনধারীর সংখ্যা বেড়েছে। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি চলে। এরা সবাই ঠিকমতো কর প্রদান করে কি না। এত মানুষ বড়ো বড়ো হোটেলে খায়-দায় ঘুরে বেড়ায় এরা ঠিকমতো কর দেয় কি না? দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মালামাল ঢাকায় আসার পথে মাঝখানে কিছু মানুষ যে মুনাফা লুটে নিচ্ছে তারা কি ঠিকমতো কর প্রদান করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এত এত মাছের ঘের আছে এরা ঠিকমতো কর প্রদান করে কি না। এদের মধ্যে একটি দল আছে যারা ঠিকমতো কর প্রদান করে না। আবার কিছু আছে একেবারেই কর প্রদান করে না। যারা কর প্রদানের উপযুক্ত তারা কর প্রদান করে কিনা। আর কর দিলেও ঠিকমতো দেন কিনা তা দেখতে হবে। যারা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন তারা কি কর প্রদান করেন? এ ধরনের আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখান থেকে কর আদায় করা সম্ভব সেখানে কর আদায় করা হচ্ছে কিনা? নতুন নতুন করদাতা এবং করের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করে কর বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

সরকার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিবছর সাড়ম্বরে কর মেলার আয়োজন করছে। এই কর মেলা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ড. মজিদ বলেন, ২০০৮ সালে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে প্রথম কর মেলার আয়োজন করা হয়। তিনি নিজে এবং কর কমিশনারদের নিয়ে প্রত্যেক উপজেলায় গিয়েছেন সরাসরি করদাতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। করদাতা রাজস্ব অফিসে এসে কর দেবে এই সনাতনী ধারণার পরিবর্তন করার জন্য আমি চেয়েছিলাম কর কর্মকর্তাদের তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমরা যখন সেনবাগে যাই তখন সেখানকার একজন বৃদ্ধ মানুষ মতবিনিময় সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, স্যার, আপনার পক্ষে তো থানায় থানায় করের অফিস খোলা সম্ভব নয়। আমার পক্ষে তো নোয়াখালি গিয়ে কর প্রদান করা কষ্টকর ব্যাপার। আমি নোয়াখালি গিয়ে কর প্রদান করতে চাইলে এক পর্যায়ে হয়ত স্বেচ্ছায় কর দেওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারি। তার চেয়ে বরং আপনারা যেখানে কর অফিস নেই সেখানে একটি নির্দিষ্ট দিনে কর আদায়ের ব্যবস্থা করলে মানুষ কর প্রদানে সক্ষম হবে। তিনি কর মেলা আয়োজনের প্রস্তাব দেন। আমি ঢাকায় ফিরে এসে কর মেলা আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সেই বছরই দেশের প্রায় সব উপজেলায় তারিখ দিয়ে কর মেলার আয়োজন করেছি। কিছু কিছু জেলা শহরেও কর মেলা করেছি। ঢাকাতেও আমরা কর মেলার আয়োজন করি যদিও তা ছিল একটু ভিন্নভাবে। যেমন–আমরা কর কর্মকর্তাদের একদিন বঙ্গবন্ধু

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলাম। বলে দেওয়া হলো যত ডাক্তার আছেন তারা এখানে কর প্রদান করবেন। এভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিসে কর মেলার আয়োজন করি। এই কর মেলার কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। এর মাধ্যমে কর কর্মকর্তা এবং করদাতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

কীভাবে হয়রানিমুক্তভাবে মানুষ কর প্রদান করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন স্থানে যে আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা ইতোমধ্যেই সাধারণ করদাতাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। অনেকেই এই কর মেলার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করেন। ২০১৬ সালে সর্ব শেষ যে আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে প্রচুর মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। এ সময় যে কর আদায় হয় তা ছিল এযাবতকালের মধ্যে একটি রেকর্ড। এ সময় মোট ২ হাজার ১২৯ কোটি ৬৭ লাখ ৭৫ হাজার ৮১১ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। আয়কর মেলা চলাকালে দেশব্যাপী ১ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৮ জন কর রিটার্ন দাখিল করেন। ৩৬ হাজার ৮৫৩ জন করদাতা আইডেনটিফিকেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড লাভ করেন। মোট ৯ লাখ ২৮ হাজার ৯৭৩ জন করদাতা বিভিন্ন ধরনের সেবা লাভ করেন। মেলা চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ২৩টি স্পেশাল হেল্প বুথ খোলা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৫০টি স্থানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে ৭দিন, জেলা পর্যায়ে ৪দিন, ২৯টি উপজেলায় ২দিন এবং ৫৭টি উপজেলায় এক দিন করে এই কর মেলা চলে।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর আদায় বাড়ানোর সুযোগ আছে। অর্থনীতির যেখানে যেখানে লেনদেন হয় সেখানেই করারোপের সুযোগ আছে। মানুষ সাধারণভাবে কর প্রদান করতে চায়। তারা সহজ পদ্ধতিতে ঝামেলা মুক্তভাবে কর প্রদানে আগ্রহী। কর প্রদান আরো সহজীকরণ করা গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কর আদায় করা সম্ভব বলে তারা মনে করেন। বর্তমানে আমাদের করের সবচেয়ে বড়ো খাত হচ্ছে উৎস কর। যিনি উৎস কর প্রদান করেন তিনি তো আরো কর দিতে পারেন। সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর সার্কেল অফিস আগের তুলনায় অনেক বাড়ানো হয়েছে। কর পরিদর্শক এবং অন্যান্য লোকবলও বৃদ্ধি করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে যাদের বাড়ি আছে তাদের অনেকেই ঠিকমতো কর প্রদান করেন না। কর পরিদর্শকগণ যদি কর আদায়ে আরো সচেষ্ট হন তাহলে বাড়িওয়ালাদের নিকট থেকে বর্ধিত হারে কর আদায় করা সম্ভব। কর পরিদর্শকরা তো জানেন তার এলাকায় কতগুলো বাড়ি আছে। কোন্ বাড়ির কর কেমন হতে পারে তা তার জানা আছে। পরিকল্পিতভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আইন জারি করে সে মোতাবেক কর আদায়ের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যে কর প্রদান করা হচ্ছে তা ঠিক মতো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়ছে কি না– আর যারা দিচ্ছেন তারা পুরোটা দিচ্ছেন কি না সেটা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে বৃহৎ করদাতারা ঠিকমতো কর দিচ্ছেন কি না সেটা দেখতে হবে। বাংলাদেশের করদাতাদের মধ্যে ৯২ শতাংশ হচ্ছে সাধারণ করদাতা। আর ৮ শতাংশ হচ্ছে অন্যান্য করদাতা। কর ফাঁকি দিচ্ছেন এসব করদাতারা। বৃহৎ করদাতারা যাতে কর ফাঁকি দিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের কর ব্যবস্থায় কিছু কিছু দুর্বলতা আছে এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। অনেকেই আছেন ঠিক মতো কর প্রদান করেন না। কেউ বা রীতিমতো কর ফাঁকি দেন। আবার সাধারণ ক্রেতা-ভোক্তাদের অসতর্কতার কারণেও তাদের দেওয়া কর ঠিকমতো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হচ্ছে না। কারণ অধিকাংশ মানুষই কোনোকিছু ক্রয় করলে ক্যাশ ম্যামো গ্রহণ করেন না। বিক্রেতারা এই সুযোগে ক্রেতাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় করলেও তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন না। এই প্রবণতা বন্ধ করা গেলে রাজস্ব আদায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেত। ইলেক্ট্রিক ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর) এখনো সর্বত্র চালু হয়নি। ইসিআর পূর্ণ মাত্রায় চালু করা গেলে বিক্রেতা পর্যায়ে কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা অনেকটাই রোধ করা যেত। সরকার কর আদায় ব্যবস্থা আরো স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া উচ্চ হারে করারোপের পরিবর্তে অধিক সংখ্যক মানুষ ও অর্থনৈতিক খাতকে করের আওতায় নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য নানাভাবে প্রণোদনা দিচ্ছে। বিশেষ করে তিন শত সফল করদাতাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তিনটি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। যুব করদাতা এবং মহিলাদেরও পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত বছর ১২৫ জন উচ্চ মাত্রার ট্যাক্স প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হয়েছে। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ২০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে করদাতাদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা কর প্রদানের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে জানতে পারে।

১লা নভেম্বর ২০১৬ আয়কর মেলা, চট্টগ্রাম

চলতি অর্থবছর থেকে সংশোধিত ভ্যাট আইন চালু হবার কথা ছিল। এই আইনের মূল উপজীব্য হচ্ছে সবার জন্য একই হারে ভ্যাট প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। এই ভ্যাট হার হবে ১৫ শতাংশ। কিন্তু বিভিন্ন মহল বিশেষ করে দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণি সংশোধিত ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন বিলম্বিত করার দাবি উত্থাপন করায় শেষ পর্যন্ত আগামী ২ বছরের জন্য এই আইন বাস্তবায়ন স্থগিত করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবার কারণে চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায় ২০ হাজার কোটি টাকা কম হতে পারে। তিনি রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। এ জন্য তারা বছরের শুরু থেকেই জোর প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে লার্জ ট্যাক্স ইউনিট(এলটিইউ)। চলতি অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এই ইউনিটকে আরো কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে এলটিইউ তাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭৯৯ কোটি টাকা কর বেশি আদায় করেছে। তারা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৬ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় করেছে ৩৬ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের জন্য তাদেরকে ৩৫ শতাংশ বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তাদের মোট ৫০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করতে হবে। ২০১৫-'১৬ অর্থবছরে এলটিইউ রাজস্ব আদায় করেছিল ৩০ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা। গত অর্থবছর তাদের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২১ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদায়কৃত ভ্যাটের ৫৫ শতাংশই এই বিভাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এলটিইউ–এর একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও তারা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবেন। যদিও এই কাজটি কিছুটা হলেও কঠিন তবে অসম্ভব নয়। তিনি আরো জানান, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তারা বছরের শুরু থেকেই বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বকেয়া রাজস্ব আদায় এবং মামলায় আটকে থাকা রাজস্ব আহরণে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এ জন্য বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তিকে গুরুত্ব দেয়া হবে। এলটিইউ ভ্যাট অফিসের প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব মামলায়ই আটকে আছে। এছাড়া ভ্যাট আদায়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করা হবে।

রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট কার্যক্রম জোরদার করা এবং আমদানি করা পণ্যের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা পুনঃমূল্যায়নের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে। রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে রাজস্ব কর্মকর্তাদের ১৪ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কাস্টমস পলিসি শাখা দেশব্যাপী ১৭টি কাস্টমস অফিসের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ভ্যালুয়েশন এবং ডিক্লারেশন ম্যানেজমেন্ট উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাস্টমস অফিসগুলোকে আরো বেশি সক্রিয় করা হচ্ছে, যাতে তারা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমর্থ হয়। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ গত অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় করতে সমর্থ হয়। তারা ৩৬৭ দশমিক ০৯ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব আদায় করে। বেনাপোল কাস্টমস হাউজ ৩৮ দশমিক ১৪ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব আদায় করে। ঢাকা কাস্টমস হাউজ ৩১ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন টাকা, মংলা কাস্টমস হাউজ ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন টাকা এবং ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো কমলাপুর ১৯ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব আদায় করে। সারা দেশে মোট ১২টি ভ্যাট কমিশনারেট অফিস রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি অফিস ১৮ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। গত অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্ভাবনার একটি দেশ। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে অতীতে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি। বিশেষ করে '৭৫ পরবর্তী সামরিক সরকারগুলোর আমলে বাংলাদেশকে পরনির্ভর করে তোলা হয়েছিল। যে কারণে অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে পুরো মাত্রায় কাজে লাগানো যায়নি। বর্তমান সরকার নানাভাবে অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিশ্ব দরবারে 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামীতে বাংলাদেশের উন্নয়নকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি কার্যকর এবং টেকসই উন্নত দেশে পরিণত করা। একসময় যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে তামাশা করত এখন তারাও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা ইচ্ছে করলে উন্নয়ন ব্যয়ের পুরোটাই নিজস্ব অর্থায়নে সম্পন্ন করতে পারি। যে কারণে বিশ্বব্যাংক ভুয়া অভিযোগ উত্থাপন করে পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন বাতিল করে দিলেও এখন আবার তারা বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসছে। এটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণেই। বাংলাদেশ তার নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে উন্নয়নে পথে নিয়ত ধাবিত হচ্ছে। এই চলা সম্ভব হচ্ছে নিজস্ব অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কারণে। বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাকে আরো আধুনিকায়ন এবং সময়োপযোগী করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, আগামীতে রাজস্ব আদায় আরো বৃদ্ধি পাবে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এবং হার উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অপার সম্ভাবনার একটি দেশ। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখন আর উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়নের জন্য বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। নিজস্ব উদ্যোগেই উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারি। আগামীতে আমাদের উন্নয়নের ভলিউম আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। তখন অর্থায়নের জন্য স্থানীয় বা অভ্যন্তরীণ উৎসগুলোকে আরো সক্রিয় করতে হবে। বিশেষ করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। আরো অনেক খাত রয়েছে যা এখনো কর জালের বাইরে রয়ে গেছে। এগুলোকে খুঁজে বের করে কর জালের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থের জন্য বাইরের কারো মুখাপেক্ষ হয়ে থাকাটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে আমাদের অবশ্যই বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। ভালো কোনো কিছু পেতে হলে কিছুটা ছাড় দিতেই হবে। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে ট্যাক্স দিতে হবে। এই মানসিকতা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। ট্যাক্স দেওয়াটা আমাদের জাতীয় এবং নৈতিক দায়িত্বও বটে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ট্যাক্স প্রদানের মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। সবাইকে বুঝতে হবে এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। ট্যাক্স প্রদান কোনো বিশেষ কৃতিত্ব নয় এটা জাতীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে আমাদের সবাইকে তৎপর হতে হবে। কেবল মাত্র তাহলে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

লেখক : অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক

নিবন্ধ

অবাধ তথ্য প্রবাহ ও তথ্য মন্ত্রণালয়

মীর আকরাম উদ্দীন আহম্মদ

দেশের উন্নয়নকে টেকসই, গতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক করতে অবাধ তথ্য প্রবাহের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার অনুসৃত এ অন্যতম মূলমন্ত্র বাস্তবায়নে কাজ করছে তথ্য মন্ত্রণালয়। উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় সে কাজেরই অংশ। তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৪টি সংস্থার সহায়তায় দেশে তথ্যের অবাধ প্রবাহের ফলে জনগণ একদিকে উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে আরো সচেতন হচ্ছে, অন্যদিকে জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সম্পর্কে সরকারও অবহিত হচ্ছে। এ দু'য়ের কার্যকর সমন্বয়ে এগিয়ে চলেছে দৃপ্ত বাংলাদেশ।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যমের জোরালো ভূমিকাকে বর্তমান সরকার সবসময় বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। তারই অংশ হিসেবে সরকারের ধারাবাহিক দুই মেয়াদের বিগত সাড়ে ৮ বছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবসম্মত কার্যক্রম দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যমের অপরিহার্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নে গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ যে আবশ্যক- তথ্য মন্ত্রণালয়ের তৎপরতায় এটি আজ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ।

এক নজরে দেখা যায়, গণমাধ্যমের উন্নয়নে এ সময়ে নতুন ১৭৬৪টি পত্রিকা নিবন্ধিত হয়েছে; বেসরকারি খাতে নতুন ৩৬টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদনসহ ২৪টি এফ. এম. বেতার এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিওর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক মিলে মোট পত্রিকার সংখ্যা ২৮৯০টি; বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র নিয়ে সরকারি ৪টি ও অনুমোদনপ্রাপ্ত ৪৪টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মধ্যে ২৬টি সম্প্রচাররত; পাশাপাশি সম্প্রচারিত হচ্ছে ২১টি এফ. এম. বেতার ও ১৭টি কমিউনিটি রেডিও। সংবাদপত্রকে ঘোষণা করা হয়েছে শিল্প হিসেবে।

চলচ্চিত্র খাতের উন্নয়নে চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' ঘোষণাসহ ৩রা এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত এ খাতকে দিয়েছে নতুন প্রেরণা। এ সময়ে ৫২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ২৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সরকারি অনুদান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারি অনুদানে ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উন্নীত হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকায়। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রতি অর্থবছরে ন্যূনতম ১টি করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যও সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে যোগ হয়েছে পোশাক ও সাজসজ্জা নামক ২টি নতুন ক্ষেত্র, বৃদ্ধি পেয়েছে পুরস্কারের মূল্যমান।

দেশের মানুষের বৈষম্যমুক্ত সমৃদ্ধির পথনকশা হিসেবে 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সব সংস্থার মাধ্যমে তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে দেশব্যাপী। একটি বাড়ি একটি খামার, ডিজিটাল বাংলাদেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সবার জন্য বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ (মানসিক স্বাস্থ্য), আশ্রয়ণ প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ শীর্ষক প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে একযোগে প্রকাশনা, প্রচার, সম্প্রচার ও কর্মশালা আয়োজন করে চলেছে তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর সবকটি সংস্থা।

গণমাধ্যম ও গণসংযোগ খাতের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও সংস্কারে নেওয়া হয়েছে ২২টি নতুন প্রকল্প। এসব প্রকল্পের মধ্যে ৫টি বিভাগীয় শহরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপনসহ দেশব্যাপী বিটিভি'র ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন ও সেন্ট্রাল সিস্টেম অটোমেশন, বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফ.এম সম্প্রচার সম্প্রসারণ এবং প্রতিটি জেলায় তথ্য অফিসসমূহের আধুনিকায়নসহ জেলা তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ অন্যতম।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরো গতিশীল করা, আইনের আওতায় আনা এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত সাড়ে ৮ বছরে ১৫টি আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় গঠিত তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে ২০ হাজারেরও বেশি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ৬৪টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভার মাধ্যমে এ আইন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩-এর আওতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই) এবং বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪-এর আওতায় স্থাপিত সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট দেশের গণমাধ্যমের উৎকর্ষ ও কল্যাণে শুধু নজিরবিহীন দৃষ্টান্তই তৈরি করেনি, আগামী দিনগুলোতে গণমাধ্যমকে সমৃদ্ধ করতে দিয়েছে প্রাতিষ্ঠানিকতার স্থায়ী রূপ।

প্রাতিষ্ঠানিক সুফল ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছে গণমাধ্যম জগৎ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট উদ্‌বোধন করেন। তখন থেকেই এ ইনস্টিটিউট চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা, কলাকুশলী সৃষ্টি ও গবেষণার উদ্দেশ্যে নিয়মিত সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে।

সাংবাদিকদের কল্যাণে যুগান্তকারী 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪-এর আওতায় গঠিত ১৩ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটে (পিআইবি) স্থাপিত অস্থায়ী কার্যালয়ে ট্রাস্টের কাজ শুরু করেছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন পিআইবির মহাপরিচালক। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট-এর অনুকূলে এক কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দসহ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে সিডমানি হিসেবে ৫ কোটি টাকা জমা আছে। নবগঠিত এ ট্রাস্ট এবং সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা ২০১২- এর আওতায় ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছেন ৮১৯ জন অনুদানভোগী।

সার্বিকভাবে গত সাড়ে আট বছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সুবিশাল কর্মযজ্ঞে দেশে গণমাধ্যমের যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে এবং অবাধ তথ্য প্রবাহের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, তা দেশের মানুষকে যেমন অধিকার-সচেতন করেছে, তেমনি রাষ্ট্রের পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে ঘটিয়েছে জনমানুষের অনন্য সংযোগ। এই অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে–এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়

সুন্দরবনের সম্রাট বাঘ মামা

আ ন ম আমিনুর রহমান

সুন্দর বলেই তার নাম সুন্দরবন। যেমন সুন্দর তার ঘন গাছপালা ঘেরা জঙ্গল, তেমন তার প্রাণী-পাখি-প্রজাপতি-কীটপতঙ্গ। আর সুন্দর তার মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নদী-নালা-খাল-মোহনা-খাড়ি। সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো লোনাজলের বন বা লবণাম্বু (Mangrove) বন। গরান বন নামেও পরিচিত। আয়তনে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন প্রায় ৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা প্রায় ২,৪০০ বর্গমাইল, যা ভারতের পশ্চিবঙ্গের সুন্দরবন অংশের প্রায় দ্বিগুণ। যদিও নানা কারণে সুন্দরবনের পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন, তথাপি এখনও যতটুকু আছে তাও পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কিন্তু এতকিছু ছাপিয়ে যে সৌন্দর্যের জন্য বাংলাদেশের এ বনটির দুনিয়াজোড়া খ্যাতি তা নিশ্চয়ই কারো অজানা নয়। হ্যাঁ, এ সৌন্দর্য শৌর্যবীর্যের প্রতীক, হিংস্রতার প্রতীক, গর্বের প্রতীক সুন্দরবনের সম্রাট 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বা বাঘ। আমাদের জাতীয় পশু।

বাঘ এদেশে ব্যাঘ্র বা বাঘ মামা নামে পরিচিত। ইংরেজি নাম Tiger, Bengal Tiger, Royal Bengal Tiger বা Indian Tiger. Felidae (ফ্যালিডি) গোত্রের সদস্য বাঘের বিজ্ঞানভিত্তিক নাম Panthera tigris (প্যানথেরা টাইগ্রিস)। পৃথিবীতে বাঘ প্রজাতিটির রয়েছে আটটি উপপ্রজাতি। জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) রেকর্ড অনুযায়ী, সাইবেরিয়ার বাঘ থেকে অন্যান্য উপপ্রজাতি বিবর্তিত হয়েছে বলে বিজ্ঞানিরা মনে করেন। আটটি উপপ্রজাতির মধ্যে ক্যাস্পিয়ান, বালি ও জাভা বাঘ চিরতরে দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সাইবেরিয়ান, ইন্দোচাইনিজ, ম্যান্ডারিন আর সুমাত্রা বাঘও হারিয়ে যাওয়ার পথে। এর মধ্যে সাইবেরিয়ার উপপ্রজাতির অবস্থা সব থেকে করুণ। বর্তমানে শুধু বেঙ্গল টাইগার উপপ্রজাতিটিই (Panthera tigris) পৃথিবীতে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে সেও আজ হুমকির মুখোমুখি। আর তা এই মানুষের কারণেই।

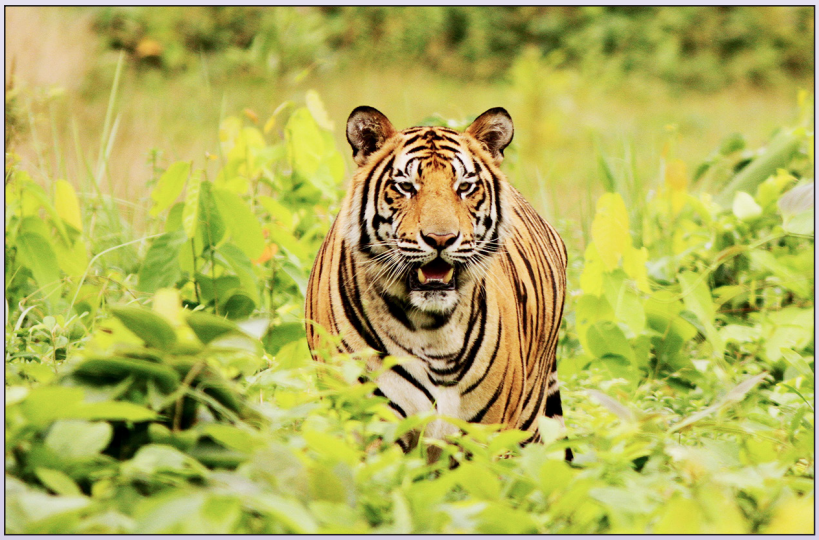

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

অন্যান্য উপপ্রজাতির থেকে সংখ্যায় যেমন বেঙ্গল টাইগার বেশি, তেমনি শৌর্যবীর্য আর সৌন্দর্যেও। বিশেষ করে আমাদের সুন্দরবনের বাঘ তো ভারত, নেপাল, বার্মা বা মিয়ানমারের গুলোর থেকেও সুন্দর আর হিংস্র। সুন্দরবনের এই বাঘকে ঘিরে রয়েছে নানা গল্প, কিংবদন্তি বা মিথ (Myth)। বনের বাওয়ালি (অর্থাৎ কাঠুরে), মৌয়াল (বা মধু সংগ্রহকারী), জেলে ও আশপাশের এলাকার লোকদের ধারণা বাঘের নাম মুখে নিলে তাকে অপমান করা হয়; এতে তাদের অমঙ্গল হবে। তাই বিভিন্ন বিশ্বাস মতে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। বড়ো মামা, বড়ো শিয়াল, বনরাজা, বড়ো কর্তা, বড়ো সাহেব, গাজী ঠাকুর, বড়ো পাইক এসবই বাঘের এক একটি নাম। রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামটি ব্রিটিশদের দেওয়া।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা বেঙ্গল টাইগার বিড়াল পরিবারের প্রাণী। বিজ্ঞানীদের মতে, বাঘের এই উপপ্রজাতিটি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ১২,০০০ বছর আগে আবির্ভূত হয়। বাঘের পূর্বপুরুষের নাম খড়্গ-দাঁতি বা তলোয়ার-দাঁতি বাঘ (Saber-toothed tiger)। এদের উপরের চোয়ালের ছেদন দাঁত দুটো দেখতে তলোয়ারের মতো ছিল যা দিয়ে সহজেই শিকারকে বিদ্ধ করা যেত। তারপর অনেক বছর গড়িয়ে গেছে। উপরের চোয়ালের ছেদন দাঁত ছোটো হয়ে বর্তমান আকারে এসেছে। উৎপত্তি হয়েছে বর্তমানকালের বাঘ প্রজাতির। এরপর উৎপত্তি হয়েছে বাঘের উপপ্রজাতিগুলোর। আবার কোনো কোনো উপপ্রজাতি ইতোমধ্যে হারিয়েও গেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও বাঘের শিকার ঘায়েল করার ক্ষমতা কিন্তু কমেনি এতটুকুও। তবে কোনো কারণে বাঘ এই দাঁত হারালে আর স্বাভাবিক নিয়মে শিকার করতে পারে না। জীবনরক্ষার জন্য তাকে বেছে নিতে হয় ভিন্ন পথ।

বাঘ সবচেয়ে বড়ো বিড়াল জাতীয় প্রাণী। লেজ বাদে দেহের দৈর্ঘ্য ১৪০-২৮০ সেন্টিমিটার (সেমি.), লেজ ৬০-১১০ সেমি. ও উচ্চতা ৯৫-১১০ সেমি.। বাংলাদেশের জাতীয় পশুর দেহের লোম সোনালি বা কমলা ও তাতে চওড়া কালো ডোরা থাকে। দেহতলের মূল রং সাদা। লম্বা লেজটিতে থাকে কালো ডোরা। পুরুষের মাথার দুপাশে লম্বা লোম থাকে। চোখ অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিশাল আকারের মাথাটা গোলাকার। ১৮০-২৮০ কেজি ওজনের বাঘ মামা অত্যন্ত শক্তিশালী। নিজের থেকে দু'তিনগুণ বেশি ওজনের পশু শিকার করে অনায়াসেই টেনে নিয়ে যেতে পারে।

বাঘ বর্তমানে বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল ও মহাবিপন্ন প্রাণী। আর পুরো বিশ্বে এটি এখন বিপণ্ন বলে স্বীকৃত। আগে সারাদেশের বনজঙ্গলে বাঘ বাস করলেও পঞ্চাশের দশকের পর এদেরকে সুন্দরবন ছাড়া দেশের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। সর্বশেষ ১৯৬২ সালে পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধায় শেষ গ্রামীণ বনের বাঘটি মারার পর এদেশের গ্রামে আর কোনো বাঘ দেখার রেকর্ড নেই। বাংলাদেশে সর্বমোট কতগুলো বাঘ আছে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সময় আমাদের সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের বাঘশুমারি ও প্রকৃতি সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সংস্থা আইইউসিএন, বাংলাদেশ (IUCN, Bangladesh)-এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের সুন্দরবনে

সুন্দরবনের বাঘ

১০৬-৫০০টির মতো বাঘ থাকতে পারে। আর এ সংখ্যা প্রতিনিয়তই কমছে। আসার কথা অতি সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিভাগের মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা, যেমন- কাসালং রিজার্ভ ফরেস্ট ও সাঙ্গু-মাতামুহুরি অভয়ারণ্যে এবং সিলেট বিভাগের ভারতীয় সীমান্তবর্তী পাথারিয়া হিল রিজার্ভ ফরেস্টে বাঘের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সুন্দরবনের সম্রাট বাঘ নির্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা আর নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে। তাছাড়া সে চলেও একা। দক্ষ সাঁতারুও বটে। মল মূত্রের মাধ্যমে নিজের বিচরণ এলাকা চিহ্নিত করে। এই গন্ধ পেলে অন্য কোনো বাঘ সেখানে যায় না। তাছাড়া তার নির্দিষ্ট এলাকায় অন্য কোনো বাঘকে সে বরদাস্তও করে না। মূত্র ছাড়াও বাঘ গাছের বাকল আঁচড়েও নিজের সীমানা নির্ধারণ করতে পারে। গরান বন, চিরসবুজ ও কনিফার বন, শুষ্ক কণ্টকময় বন, উঁচু ঘাসবন ইত্যাদি এলাকায় বাঘ বাস করে। দিনের বেলা কাঁটায় ভরা হেতাল গাছের আড়ালে শুয়ে থাকে। নদী বা খালের পাড়ে জন্মানো অত্যন্ত ঘন গোলপাতার বনও মামার প্রিয় জায়গা। বাঘ যেমন হিংস্র তেমনি বুদ্ধিমানও বটে। সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যায় শিকারে বের হয়; কখনো কখনো রাতে। মামা শিকারও করে একা, আর ভোজও সারে একা। চিত্রা হরিণ, বুনো শুয়োর, বানর, সজারু, গিরগিটি, বড়ো পাখি ইত্যাদি প্রিয় খাবার। তবে খাদ্যের অভাবে মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদিও খেতে পারে।

বাঘ কিন্তু জন্মসূত্রে মানুষখেকো হয় না। বরং মানুষকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে শক্তি কমে এলে, কোনো কারণে আহত হলে (সজারুর কাঁটায় আহত হওয়াটা সচরাচর দেখা যায়), ছেদন দাঁত বা কুকুর দাঁত ভেঙে গেলে, জেলে-বাওয়ালি, বাজ-ঈগল-বানরের অত্যাচারে, মৌমাছির হুলের জ্বালায় এদের মাথা ঠিক থাকে না। আর তখনই মানুষকে আক্রমণ করে। অনেক সময় বনের চরে কবর দেওয়া মৃত জেলে-বাওয়ালির মাংস খেয়েও মানুষের নোনা মাংসের স্বাদ পায়, যা আর কোনোদিন ভুলতে পারে না। ফলে পরিণত হয় মানুষখেকোতে। সন্তানহারা বাঘিনীও রাগে-দুঃখে, প্রতিহিংসায় মানুষখেকো হতে পারে। আবার মানুষখেকো বাঘিনীর শিকার করা নরমাংস খেয়ে বাচ্চারাও যে নোনা স্বাদ পায় তার ফলে বড়ো হয়ে এরাও মানুষখেকোতে পরিণত হতে পারে।

বাঘ মামা কখনোই পিছু হটতে জানে না। একবার কোনো শিকারকে তাক করলে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। তবে, ব্যর্থতার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকলে সেই শিকার ধরা থেকে বিরত থাকে। আবার নতুন করে পজিশন নেয়। শিকারের জন্য দেড়-দুই কিলোমিটার চওড়া নদীও পার হতে পারে। মামা কোনো শিকারকেই সামনের দিক থেকে ধরে না। পেছন থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়াই তার স্বভাব। তাছাড়া বাতাসের বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করে বলে শিকার বাঘের গন্ধ টের পায় না। দেহ বিশাল হলেও শিকার ধরার মুহূর্তে তা কুঞ্চিত করে ছোটো করে ফেলে। মাটিতে কয়েকবার লেজ দিয়ে আঘাত করে। পায়ের থাবায় লুকানো নখ বের করে আনে। লেজ পাকিয়ে খাড়া করে নেয়। পায়ের তলায় নরম মাংসপিণ্ড থাকায় শিকারের একবারে আগ মুহূর্তেও কোনো শব্দই হয় না। এরপর হঠাৎ করেই বিশাল এক হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর। শিকার ধরে তাতে দাঁত বসিয়ে টেনে শ'খানেক মিটার দূরে নিয়ে যায়। সেখানেই ভূড়িভোজ সারে। ভোজশেষে পেটপুরে পানি পান করে। তারপর দেয় লম্বা ঘুম। ভোজ একবারে শেষ করতে না পারলে তা মাটি, পাতা দিয়ে লুকিয়ে রাখে ও অন্য সময় খায়। একবারে প্রায় ২৫-৩০ কেজি মাংস খেতে পারে। সুন্দরবনের সৌন্দর্য রয়েল বেঙ্গলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পচাব্দী গাজীর নাম। সুন্দরবনের এই কৃতী সন্তান প্রায় ষাটটি বাঘ শিকার করেছেন, যার বেশিরভাগই ছিল মানুষখেকো।

বাঘ বছরের যে-কোনো সময়ই প্রজনন করতে পারে। এ সময় বাঘ মামার গগনবিদারী বা আকাশ কাঁপানো হুংকার শোনা যায়। সে হুংকারে কেঁপে ওঠে বন-জঙ্গল, খাল-নদী আর বনের পশুপাখি। বাঘিনী ১০৪-১০৬ দিন গর্ভধারণের পর ৩-৫টি অন্ধ বাচ্চার জন্ম দেয়। এ সময় সে অত্যন্ত নিরিবিলি জায়গায় আশ্রয় নেয়। পুরুষ বাঘের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সতর্কতার সাথে বাচ্চাদের রক্ষা করে। কারণ, সুযোগ পেলেই বাঘ মামা বাচ্চাদের খেয়ে ফেলবে। এ কারণেই জন্মানোর পর অর্ধেক বাচ্চাও বড়ো হতে পারে না। বাচ্চাহারা বাঘিনী অত্যন্ত হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। জন্মের প্রায় দশ দিন পর বাচ্চাদের চোখ ফোটে। এরা প্রায় আট সপ্তাহ মায়ের দুধ পান করে। এরপর মায়ের শিকার করা খাবারে মুখ লাগায়। ধীরে ধীরে মায়ের কাছ থেকে শিকার করা শেখে। বাঘিনী এক-দেড় বছর বাচ্চাদের চোখে চোখে রাখে। আর আড়াই-তিন বছর বয়সে যখন দ্বিতীয়বার এদের দাঁত গজায় তখন থেকেই এরা পুরোপুরি স্বাধীন। তখন আর মায়ের সঙ্গে থাকে না। পুরুষ বাচ্চা ৪-৫ ও স্ত্রী ৩-৪ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। এরা দু'তিন বছরে একবার মাত্র প্রজনন করে। বাঘ ১৫-২০ বছর বাঁচে।

এ দেশের গৌরব সুন্দরবনের সম্রাট আজ চোরা শিকারিদের কারণে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। ভারতে বাঘ প্রকল্পের মাধ্যমে এদের সংখ্যা বাড়ানো গেছে। আমাদের দেশেও এ পর্যন্ত বাঘ রক্ষার অনেক প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

তবে তা দিয়ে এখনো বাঘ সংরক্ষণের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। কাজেই এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না গেলে একদিন হয়ত সুন্দরবনের সম্রাট সৌন্দর্য আমাদের এই 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' চিরতরে হারিয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে। সেটা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়।

লেখক: বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

নবায়নযোগ্য শক্তি ও বাংলাদেশ

ফজলে রাব্বি খান

বর্তমান বিশ্বে মানবসভ্যতার অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য শক্তি ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার একটি সার্বজনীন বিষয়। শিল্পায়ন মানবজাতিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতি উপহার দিলেও, মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ আমাদের জন্য এখন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবসভ্যতা নিজের অগ্রগতি ও স্বার্থের জন্য পরিবেশের অন্যান্য উপাদান ও সদস্যকে ক্রমশ বিপন্ন করেছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে মানবজাতির অস্তিত্ব এখন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার অগ্রযাত্রা শক্তি ও জ্বালানির ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, শক্তি ছাড়া পৃথিবী অচল, সভ্যতা অচল। কলকারখানা, যানবাহন সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন শক্তির।

একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, পৃথিবীর মোট শক্তির ৮৬.৪ শতাংশ আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে (পেট্রোলিয়াম ৩৬, কয়লা ২৭৪ এবং গ্যাস ২৩)। প্রতিবছর পৃথিবীতে শক্তির চাহিদা ২৩ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীতে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎসের ভেতর কয়লার আনুমানিক মজুত ৯০৫ বিলিয়ন মেট্রিক টন, তেল ১,১১৯ থেকে ১, ৩১৭ বিলিয়ন ব্যারেল এবং গ্যাসের মজুত রয়েছে প্রায় ১৭৫-১৮১ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার। এসকল প্রাকৃতিক জ্বালানির মজুতের হিসাব অনুযায়ী, তেল ব্যবহার করা যাবে আগামী ৪৩ বছর, কয়লা ৪১৭ বছর এবং গ্যাস ১৬৭ বছর। অবশ্য নতুন খনির সন্ধান পাওয়া গেলে এই হিসাবের পরিবর্তন ঘটবে। জীবাশ্ম জ্বালানির নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা আমাদের বিকল্প জ্বালানির সন্ধান করতে বাধ্য করেছে। নবায়নযোগ্য শক্তি এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বর্তমানে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকৃতিগতভাবেই প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে যেমন সূর্যরশ্মি, জোয়ার ভাটা, ভূগর্ভস্থ তাপ, বায়োমাস ইত্যাদি। নবায়নযোগ্য শক্তি পরিবেশের ক্ষতি করে না এবং জীবাশ্ম জ্বালানির মতো শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

বর্তমানে পৃথিবীর মোট শক্তি সরবরাহের ১৬ শতাংশ আসছে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে। এসকল উৎসের ভেতর রয়েছে সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ, জল বিদ্যুৎ, জিও থার্মাল এনার্জি, বায়োইথানল, বায়োডিজেল ইত্যাদি। নবায়নযোগ্য শক্তির এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর বিষয়কে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে। জার্মানির মোট শক্তির ৩০ ভাগ আসে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে, নরওয়ের প্রায় সবটুকু আসে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে, সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে ১১৪ শক্তির জোগান হয় বায়ু বিদ্যুতের মাধ্যমে। ডেনমার্ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ তারা সম্পূর্ণভাবে নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল হবে।

সব থেকে আশার বিষয়, বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে প্রান্তিক পর্যায়ে একটি নীরব বিপ্লব ঘটেছে। বিশ্বে সৌরশক্তি ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বে প্রান্তিক পর্যায়ে ব্যবহৃত ৬০ লাখ সৌর প্যানেলের মধ্যে ৪০ লাখই বাংলাদেশে ব্যবহার করা হয়। 'রিনিউয়েবলস ২০১৭ গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট'-এ এই তথ্য এসেছে। বাংলাদেশ বিশ্বে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে ৫ম স্থানে রয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বে ৬০ লাখেরও বেশি স্থানে সৌরশক্তি ব্যবহার চলছে, আর এতে উপকৃত হচ্ছে আড়াই কোটি মানুষ। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ বিদ্যুৎ সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে আসে, অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব চুলা (ক্লিন কুকিং স্টোভ) ব্যবহারে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম অবস্থানে রয়েছে। কেবল ২০১৪ সালেই পাঁচ লাখ পরিবেশবান্ধব চুলা স্থাপন করা হয়। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহারেও বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থানে রয়েছে।

চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ কর্ণফুলী নদীর ওপর দেশের প্রথম পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে ১৯৫৭ সালে শুরু হয় বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তির ইতিহাস। আশির দশকে সিলেটে প্রথম বেসরকারিভাবে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপিত হলেও পরবর্তীতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) কর্মসূচি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে এই সংস্থাটি নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে কাজ করে এমন সব এনজিও'কে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করে আসছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে কাজ করছে 'টেকসই ও জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'। এই সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের এই খাতের সর্বশেষ অবস্থা নিম্নরূপ :

সোলার হোম সিস্টেম ৪৪,৭৬,৭৮২টি, সোলার সেচ পাম্প ৬৭১টি, সোলার পানি বিশুদ্ধকরণ সিস্টেম ১৫২টি, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ৭১,৩৯৬টি, পরিবেশবান্ধব চুলা ৩৪,০৬,৯৩৬টি, চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ৭৫টি। জাতীয় গ্রিডে অবদান ২৮৭। জাতীয় জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে মোট ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, যা সেই সময়ের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ এর সমপরিমাণ হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত হলে ৯৫ মিলিয়ন টন অয়েল সমতুল্য জ্বালানি সাশ্রয় হবে, যা প্রায় বার্ষিক গড়ে ৫১ বিলিয়ন টাকার সমতুল্য। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশের নবায়নযোগ্য শক্তি স্থাপনের ব্যয় কিছুটা বেশি, তারপরও 'মাইক্রো ইন্সটলমেন্ট' পদ্ধতিতে গ্রামীণ জনপদে সোলার সিস্টেম স্থাপন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে কিছুটা সহজলভ্য। বর্তমানে দেশে প্রতি মাসে ৬৫ হাজারের বেশি সোলার সিস্টেম স্থাপন হচ্ছে। আর প্রতিবছর গড়ে বাড়ছে ৫৮ শতাংশ হারে । এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের বাসাবাড়িতে প্রতি বছর কেরোসিন সাশ্রয় হচ্ছে প্রায় এক লাখ ৮০ হাজার টন। নবায়নযোগ্য শক্তির এই প্রসারের জন্য ইডকল ছাড়াও গ্রামীণ শক্তি, ব্রাইট গ্রিন এনার্জি ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য এনজিও'র বিশেষ অবদান রয়েছে। এই খাতের প্রসারের মাধ্যমে নতুনভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিবছর নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাংলাদেশে ১০% হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। তবে

গ্রামবাংলায় সোলার প্যানেলের ব্যবহার

দেশীয় প্রেক্ষাপটে বর্জ্য রিসাইকেলিং বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়নি, যদিও এটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বৃহৎ পরিসরের নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়েও জোর দিতে হবে।

প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানি শুধু যে নিঃশেষিত হচ্ছে তাই নয়, এ থেকে তৈরি হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাস-এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে (গ্লোবাল ওয়ার্মিং), এবং সৃষ্টি হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন, বন্যা, খরা, সুনামী, ইত্যাদি নানা ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়। পৃথিবীতে প্রতিবছর ২১৩ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ার ফলে, কিন্তু পৃথিবীর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শুষে নেওয়ার ক্ষমতা এর অর্ধেক। ফলে বিগত ১০০ বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ১৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট, যার দুই-তৃতীয়াংশ বেড়েছে বিগত তিন দশকে। খুব কম করে ধরলেও এই একবিংশ শতাব্দীতে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে আরো ২ থেকে ৫২ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এর ফলে বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ পৃথিবীর নিম্নভূমির অন্যান্য দেশের প্লাবিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে সৃষ্টি হবে বিপুল সংখ্যক জলবায়ু উদ্বাস্তু। এসকল বিপর্যয় থেকে মানবসভ্যতার উত্তরণের একমাত্র উপায় নবায়নযোগ্য শক্তি ও সাশ্রয়ী জ্বালানি। উন্নত বিশ্বের জাতিসমূহের উচিত এই খাতকে বিকশিত করার জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য আরো বৃহৎ পরিসরে আর্থিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে সম্প্রতি জাতিসংঘ তার 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'য় নবায়নযোগ্য শক্তি, সাশ্রয়ী জ্বালানি, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। আর নবায়নযোগ্য শক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ হতে পারে বিশ্বের মডেল।

লেখক : প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং কিছু কথা

মোহাম্মদ কায়ছার আলী

৮ই সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। ১৯৬৫ সালে ইরানের তেহরানে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ৮৯টি দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী ও পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে আলোচনা করা হয়, পৃথিবীর বর্তমান বিস্ময়কর সভ্যতায় শিক্ষার অবদান নিয়ে। শিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশর্ত শ্রেষ্ঠত্বের নিয়ামক। মানবসম্পদ উন্নয়নে এর কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক বিশ্বে সকল আবিষ্কার ও উন্নয়নের মূলমন্ত্র হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাহীন মানুষ আর পশুতে কোনো তফাৎ নেই। যার শিক্ষা নেই বলা যায় তার কিছু নেই। সম্মেলনে বিশ্বের সাক্ষরতা পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবস্থা, শিক্ষা, শিক্ষাজীবন, জীবিকা ও বয়স্ক নিরক্ষরদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা ও জীবিকা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে উল্লেখ করে নিরক্ষরতাকে উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে জোর প্রয়াস নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রথম সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়। মানবসম্পদ উন্নয়নে অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দিবসটি সারাবিশ্বের মতো যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আমাদের দেশেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। ইউনেস্কো সারাবিশ্বে জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরপরেও বিশ্বের মোট অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা নিরক্ষর (নারীদের মধ্যে বেশি)। পৃথিবীর অনেক পিছিয়ে থাকা দেশ অভিযান আকারে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, নিকারাগুয়া, লাওস ও ভিয়েতনামে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে আমাদের দেশেও পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই হলো শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগত জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষা হলো বিকশিত ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ শাস ধাতু থেকে, যার অর্থ হচ্ছে শাসন করা বা উপদেশ দান করা। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educare বা Education থেকে যার অর্থ To lead out অর্থাৎ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে নিয়ে আসা। শিক্ষার জন্য প্রথমেই চাই অক্ষর জ্ঞান। অক্ষর জ্ঞান না থাকলে মানুষ পড়বে বা শিখবে কীভাবে বা জ্ঞান অর্জন করবে কীভাবে? বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী প্রাণী মানুষ অন্যের কাছে শোনার চেয়ে বা জানার চেয়ে নিজের চোখে পড়তে বা জানতে বা শিখতে বেশি পছন্দ করে। প্রতিটি মানুষ শতভাগ নিজেকে বিশ্বাস করে। মানুষ দেখে ও শুনে বেশি মনে রাখতে পারে। আর এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো মানুষকে দেখতে, পড়তে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করা।

গভীর বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া জরুরি। ১৯৭১ সালে এদেশে শিক্ষার হার ছিল ১৬.৮%, ২০০১ সালের মার্চ মাসে আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী, শিক্ষার হার ছিল ৫১.৮%, ২০০৬ সালে ৪৪%, ২০১৩ সালে ৫৭.৯%, ২০১৫ সালে ৬২.৩%, (পুরুষ ৬৫% ও নারী ৫৯.৬%) বর্তমানে ২০১৭ সালে ৭১.৪%। এই হার আরো বাড়াতে হবে। নিরক্ষরতা একটি জটিল ও ভয়াবহ সমস্যা। কোনো জাতির উন্নতির জন্য প্রথম এবং প্রধান উপকরণ হচ্ছে শিক্ষা বা অক্ষর জ্ঞান। নিরক্ষর লোকদের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার জন্য আমাদের তাই বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে অনানুষ্ঠানিক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করেছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সারাদেশের মানুষকে আলোকিত করা। স্কুল ও কলেজের বাইরে পাহাড়ি এলাকা, দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাওর, বাঁওড়, চর, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এলাকা, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, অতি বঞ্চিত শিশু, শ্রমিক, ঝরেপড়া, পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান, হরিজন বা নিচুবর্ণের শিশুদের শিক্ষার জন্য নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। সমাজের যে কোনো অংশের নাগরিকদের বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন হয় না।

বর্তমান সরকার বৃত্তিমূলক, কারিগরি এবং কর্মমুখী শিক্ষা (হাতে-কলমে প্রশিক্ষিত) অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক শিক্ষা চালু করেছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা সেদিকে ধাবিত হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে সাধারণ শিক্ষার দ্বারা মানসিক বিকাশ ঘটলেও কর্ম ও জীবিকার নিশ্চয়তা থাকে না। কর্মমুখী শিক্ষা সেই নিশ্চয়তা বিধান করে জীবনকে হতাশা মুক্ত করে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

শারদীয় দুর্গাপূজা সম্প্রীতির মেলবন্ধন

আনোয়ার ফরিদী

আগামী ১২ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হচ্ছে বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বড়ো উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতে, অশুভ শক্তির মহাতাণ্ডবে দেবকূল অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে তাদেরই আহবানে দুর্গতিনাশিনী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী দুর্গা। দশ ভূজা দুর্গা অসুর নাশ করে দেবকূলে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাই তিনি স্বস্তিদায়িনী।

শারদীয় হাজার বছরের ঐতিহ্য লালিত এই পৌরাণিক পটভূমিকায় গাঙ্গেয়, রাঢ়, বরেন্দ্র ও সমতট এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় তাদের হৃদয়-এর অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকে দেবীদুর্গার পদতলে। মূলত বাসন্তী পূজাই হচ্ছে সত্যিকার দুর্গাপূজা। যা চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী থেকে শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে শারদীয় দুর্গোৎসব-এর সূচনা হয় কৃত্তিবাস রচিত *বাংলা রামায়ণ*-এর উদ্ধৃতি থেকে। কারণ, বাল্মীকি রচিত রামায়ণে রাম কর্তৃক দুর্গাপূজা করার কোনো উল্লেখ নেই। একারণেই শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকাল বোধন বলা হয়।

আমাদের এই বাংলায় কর্ণফুলী নদীর তীরে মেধস নামের মুনির আশ্রমে মাটির প্রতিমা তৈরি করে প্রথম দুর্গাপূজা সূচনা করেন সমাধি বৈশ্য ও সুরত রাজা। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নিয়মিত দুর্গাপূজা শুরু হয় ৪০০ বছর আগে–মহারাজা কংস নারায়ণের সময় থেকে রাজশাহীর পুঠিয়ায়। সেখান থেকে আজকের নড়াইল (প্রাচীন যশোহর) জেলার ইটনা গ্রামে। এরপরে ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশসহ পশ্চিম বাংলায়।

দুর্গাপূজা এমন একটি অনুষ্ঠান যার মাঝে রয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা। দেবীর কাঠামোতেও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়। যেমন– বিদ্যা, শক্তি, গণমানুষ, অহিংসা। অশুভ শক্তির দমনকারীর প্রতীক হিসেবে সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, সিংহ এবং অশুভ শক্তি হিসেবে অসুরকে দেখানো হয়।

অন্যদিকে তাদের বাহনগুলোও বিভিন্ন কর্মোদ্যোগের প্রতীকরূপে অবস্থান করে। যেমন হাঁস হচ্ছে সারবস্তু গ্রহণের প্রতীক, পেঁচা অশুভ সংকেত, ইঁদুর নিরলস কর্মী, ময়ূর হিংস্রতা বিরোধী এবং সিংহ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সাহসের প্রতীক।

দুর্গাপূজা শুরু হয় পিতৃপক্ষের শেষে এবং দেবী পক্ষের শুরুতে। মোট ছয় দিনের এই পূজায় ধারাবাহিক যে আচার অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে– তিথি অনুযায়ী পঞ্চমীতে দেবীর বোধন পর্ব, ষষ্ঠীতে দেবীর করারম্ভ প্রশস্তা, সন্ধ্যাকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। সপ্তমীতে-সপ্তমী পূজা। অষ্টমীতে সন্ধি পূজা। নবমীতে মহা নবমী এবং বিজয়ী দশমীতে বিহিত পূজা ও বিসর্জন।

ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগে দুর্গাপূজা ছিল জমিদার ও সামন্তপ্রভুদের ঘরোয়া পূজা। সে সময় তারা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পূজার আয়োজন করতেন। এ পূজায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। এদের বেশিভাগই ছিল প্রজাশ্রেণির মানুষ। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এধরনের পূজার আয়োজন পাকিস্তান আমলের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত টিকে ছিল। পরবর্তী সময়ে জমিদারী প্রথা লোপ পাওয়ায় এবং এর খরচপত্র বেড়ে যাওয়ায় দেবী দুর্গা জমিদার ও সামন্তরাজদের আঙিনা থেকে নেমে এলেন বারজনের সম্মিলিত আয়োজনে নির্মিত মণ্ডপে। বারোয়ারী পূজায় ধর্মীয় আচরণবিধি মেনে চলার ব্যাপার কোনো ত্রুটি ছিল না। ছিল না খুব বেশি বাহ্যিক আড়ম্বর। ধর্মীয় গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলত মিলন আনন্দ। সেকালে প্রতিমা নির্মাণেও একটি ঐতিহ্য মেনে চলা হতো। ঐতিহ্য মেনেই দেব-দেবীসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা তৈরি হতো। এখনকার মতো নানা ভঙ্গিমায় প্রতিমা নির্মাণ করা হতো না। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামীণ গৃহবধুরা বাপের বাড়ি বেড়াতে আসত। বাবা-মা, ভাইবোনদের নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতেন। এ পূজা উপলক্ষে আবহমানকাল থেকে গ্রামীণ জনপদে মেলা বসে পরবর্তীকালে। এসব মেলা পরিণত হয় সার্বজনীন মেলায়। মানুষের ঢল নামে মণ্ডপে আর মেলায়।

গ্রামীণ জনপদের পূজা হলেও ক্রমে তা নগরেও স্থান করে নেয়। দুর্গা হয়ে ওঠে নাগরিক পূজা, উৎসবের ছোঁয়া লাগে নগর জীবনেও। দুর্গাপূজার সময় নগরীতে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যময় আর আকর্ষণীয় প্রতিমা ও মণ্ডপ তৈরি নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। দর্শনার্থীদের টানার জন্যই চলে এই প্রতিযোগীতা। পূজার মণ্ডপে ঢাকের শব্দ, মাইকে জনপ্রিয় গান, বাঁশি আর ভেঁপুর শব্দ, বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানি এবং রঙবেরঙের পোশাক পরা হাজারো দর্শনার্থীর ভিড়ে উৎসবের আমেজ বয়ে যায়।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের বারো মাসের তের পার্বণের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্বণ হচ্ছে দুর্গাপূজা। আচার-অনুষ্ঠানে এটি যেমন বড়ো তেমনি এর খাবারের তালিকাও বিশাল। এই তালিকায় থাকে নানা প্রকার সুস্বাদু খাবার। লুচি-পায়েস, পাঁচ তরকারি-খিচুড়ি, পোলাও মণ্ডা-মিঠাই–সবই থাকে। পূজার এ ক'দিন বাসাবাড়িতে অতিথি আর আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। তাই এ সময়টায় প্রতিটি বাড়িতে সাধ্যমতো ভালো খাবার দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়ন করা হয়। অতিথিপরায়ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দুর্গাপূজার সময় অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনকেও নিমন্ত্রণ দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকেন। এসময় হিন্দু বাড়িগুলো সব সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। দুর্গাপূজা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় বিজয়া দশমীর দিন নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে। আবার আগামী বছর মা যেন ভক্তের বাড়িতে এসে পূজা গ্রহণ করেন–বিসর্জনের সময় দেবীর কাছে এই প্রার্থনা করা হয়। বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের জন্য দেবীর কাছে মিনতি জানানো হয়। দেবীকে বিসর্জনের পর ঘরে ঘরে চলে মিষ্টি মুখ। এ সময় পাড়া-প্রতিবেশী সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। দুর্গাপূজার পর দিন পাড়া-মহল্লার বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব নানা প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের শিল্পী ও দর্শক-শ্রোতা অংশ নিয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। আমাদের দেশে সংস্কৃতির এ এক চিরন্তন অসাম্প্রদায়িক রূপ।

মা ডাক বাঙালির সবচেয়ে প্রিয়। মা দুর্গা বাঙালি হিন্দুর ভাবমূর্তিতে শিবের জায়া। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর জননী। প্রতিবছর মা দুর্গা তাঁর সন্তানাদি নিয়ে শিবের কৈলাসভূমি থেকে পিতৃভূমি পৃথিবীতে বেড়াতে আসেন পাঁচদিনের জন্য–আশ্বিন মাসের পঞ্চমী তিথিতে। পূজা শেষে আবার ফিরে যান শিবের কাছে কৈলাসে। পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার পথে দেবী বিভিন্ন বাহন ব্যবহার করে থাকেন। এসব বাহনে চড়ে আসা-যাওয়ার ওপর বিশ্বের শুভাশুভ নির্ভর করে। গতবার দেবী দুর্গা এসেছিলেন হাতিতে চড়ে। যার অর্থ ছিল বসুন্ধরা হবে শষ্যপূর্ণ। পূজা শেষে দেবী পালকিতে চড়ে কৈলাস ফিরে গিয়েছিলেন। যার অর্থ হচ্ছে মড়ক। এবার দেবী আসবেন ঘোটকে চড়ে। যার অর্থ হচ্ছে এবার শষ্য বেশি হবে এবং পানি বৃদ্ধি পাবে। আবার ফিরবেনও ঘোটকে চড়ে। যার অর্থ হলো ছত্রভঙ্গ বা লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকাসমূহ বিশিষ্টজনদের বিশেষ লেখা এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে থাকে।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

বাংলাদেশে আদিবাসী প্রসঙ্গ

জান্নাতে রোজী

জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে 'আদিবাসী বর্ষ' ঘোষণা করে। পরের বছর ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতিবছর ৯ই আগস্ট 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া জাতিসংঘ ১৯৯৫-২০০৪ এবং ২০০৫-২০১৪ সালকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আদিবাসী দশক ঘোষণা করে। ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করা শুরু হলেও ২০০১ সালে বাংলাদেশে আদিবাসী ফোরাম গঠনের পর থেকে বেসরকারিভাবে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা ৯ই আগস্ট পালন করেছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ও আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের এক দশক উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আয়োজন করে এক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিজ্ঞান লেখক অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বক্তারা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষকে সংবিধানে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিবসটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আমাদের দেশে যে আদিবাসী দিবস পালন হচ্ছে এবং যারা পালন করছে, তারা কি প্রকৃতই আদিবাসী? নাকি তারা অভিবাসীরূপে এ ভূখণ্ডে পরবর্তীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে?

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সংস্থাগুলো– আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক আইন আদিবাসী শনাক্ত করার জন্য যে বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

- আদিবাসীরা সাধারণত তাদের পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বংশানুক্রমে বসবাস করে এবং
- তারা তাদের এলাকাগুলোতে সুস্পষ্টভাবে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধারণ করে ও মেনে চলে।

বাংলাদেশ সরকার এদেশে বসবাসরত পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের (যারা নিজেদের আদিবাসী বলে পরিচয় দেয়) আদিবাসী বা উপজাতি না বলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বিষয়ে সরকার ২০১১ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

বাংলা পিডিয়ার সূত্র মতে, বাঙালি একটি মিশ্রিত বা শংকর জাতি এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিতম মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বহু জাতি বাংলায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং অনেকে বেরিয়ে গেছে। জাতিতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর চারটি প্রধান জনগোষ্ঠী যেমন– নিগ্রীয়, মঙ্গোলীয়, ককেশীয় ও অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীগুলোর প্রতিটির কোনো না কোনো শাখার আগমন ঘটেছে বাংলায়।

ভৌগোলিক অবস্থানে বাংলাদেশ একটি গাঙ্গেয় বদ্বীপ। এটি প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অংশ। হাজার বছরের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এদেশে বাঙালিরা 'মূল আদিবাসী' বলে গবেষকরা মনে করেন। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসরত আদিবাসীদের অ্যাবঅরিজিন (Aborigin) বা ইন্ডিজিনাস পিপল (Indigenous people) বলা হয়- যারা কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা এবং ক্যাপ্টেন জেমস কুক কর্তৃক অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব থেকেই সেখানে ছিল। সে অর্থে বাংলাদেশে যারা নিজেদের আদিবাসীরূপে পরিচয় দেয় তারা মূলত আদীবাসী নয় বরং তারা পরবর্তীতে আগত অভিবাসী।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে জনসংখ্যায় সর্ববৃহৎ চাকমা সম্প্রদায়ের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ও উত্তরাঞ্চল। নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে, চাকমারা বাহির থেকে এসে তাদের বর্তমান আবাসভূমিতে বসতি স্থাপন করে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তাত্ত্বিক অভিমত অনুযায়ী, চাকমারা মূলত মধ্য মিয়ানমার ও আরাকান এলাকার আদিবাসী। ময়মনসিংহ বিভাগে বসবাসরত গারো সম্প্রদায় চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিনচিয়াং প্রদেশ থেকে এসেছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, গারোরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর তিব্বতী বর্মণ শাখার বোড়ো উপশাখার অন্তর্ভুক্ত। সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত মনিপুরিদের আদি বাসস্থান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মনিপুরে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতালদের আদি নিবাস রাঢ়-বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চল এবং পরবর্তীতে ভারতের সাঁওতাল পরগনায়। বাংলাদেশের কক্সবাজার ও পটুয়াখালী সমুদ্র উপকূলে বসবাসরত রাখাইনদের আদি নিবাস মিয়ানমারের রোসাং বা রোসাংগিরি রাজ্য। এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে যে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস তারা বিভিন্ন সময়ে অন্য স্থান থেকে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বাঙালি জাতির বয়স চার হাজার বছরেরও বেশি। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এখানে আগমন ঘটে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৬শে জুলাই ২০১১ সালে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে বাংলাদেশে আদিবাসী প্রসঙ্গ নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ছড়ানো ভুল ধারণা নিরসনের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট ব্যাখা প্রদান করা হয়। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী, জাতিসংঘ 'আদিবাসী (Indigenous people)' ও 'উপজাতি (Tribal people)' এই দুই পরিভাষার সংজ্ঞা প্রদান করেছে। সেখানে আদিবাসী তাদেরই বলা হয় যারা বংশানুক্রমে কোনো ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনের আগ থেকেই বসবাস করে আসছে। বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ১৬ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। ভারতীয় উপমহাদেশের সকল ঐতিহাসিক দলিল, 'হিল ট্র্যাক্টস অ্যাক্ট অব ১৯০০', এবং ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার-এর 'সেনসাস অব ইন্ডিয়াতে'ও এ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে 'উপজাতি' হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, 'আদিবাসী' নয়। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানেও তাদের 'উপজাতি' উল্লেখ করা হয়েছে। সকল বিচারেই মোট জনগোষ্ঠীর ৯৯% বাঙালিরাই যে এ অঞ্চলের আদি জাতিসত্তা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে এদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে (ethnic minority) 'ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সরকারের সিদ্ধান্তটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়।

এদেশের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ মৌলিক সুবিধাসমূহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক: সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

মাতৃদুগ্ধ শিশুর জীবনীশক্তি বিকাশে সহায়ক

লতা খান

'মাতৃদুগ্ধ পান টেকসই করতে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই'– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ১লা আগস্ট থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত পালন করা হয় 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় মূলত শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো কার্যক্রমকে টেকসইকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন। এ বছর মাতৃদুগ্ধ দিবসের উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী এ দিবস উপলক্ষে বাণী প্রদান করেন। বাংলাদেশে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর ১লা আগস্ট-৭ই আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে জাতীয়ভাবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচারণার ফলে মায়েরা এখন বেশি সচেতন। তৃণমূল পর্যায়ে এ সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্ব মাতৃ দুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে।

মা ও শিশু

শিশু জন্মের পর আল্লাহ তায়ালা প্রথম খাবার হিসেবে মায়ের স্তনে প্রয়োজনীয় যে খাবার পাঠান তা হচ্ছে মাতৃদুগ্ধ। এই মাতৃদুগ্ধ শিশু স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এবং শিশুর প্রথম ভ্যাকসিন। এ দুধে শিশুর জন্য এমন প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে যা শিশুকে বিভিন্ন রোগব্যাধী থেকে রক্ষা করে। এজন্য শিশুর জন্মের পর থেকে ৬ মাস পর্যন্ত এবং ২ বছর পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্যান্য খাবারের সাথে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে হবে। মাতৃদুগ্ধ শুধু শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশই নিশ্চিত করে না, মাও উপকৃত হয়। নিম্নে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা তুলে ধরা হলো–

- শিশুকে প্রথম যে মাতৃদুগ্ধ পান করানো হয় তা হচ্ছে শালদুধ। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমিষ, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন এবং এ দুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক।
- এ দুধ শিশুর প্রথম অবলম্বন, নিরাপত্তার প্রথম নিশ্চয়তা এবং বিশ্বসংসারের সাথে প্রথম যোগসূত্র ঘটায়।
- এ দুধ পানে শিশুর পর্যাপ্ত জীবনীশক্তি বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঘটে।
- এ দুধে পানি ও চিনি রয়েছে। তাই এ দুধ পান করলে শিশুর অতিরিক্ত চিনির প্রয়োজন হয় না।
- শিশুকে যে-কোনো প্রদাহ বা ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে এ দুধ।
- শিশুর ডায়রিয়াজনিত পানি শূন্যতা, বিকলাঙ্গতা, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ, শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ প্রতিরোধও করে। এছাড়া এ দুধ শিশুর দেহে মারাত্মক ৬টি রোগ প্রতিরোধক এন্টিবডি তৈরি করে।
- শিশু মৃত্যুর হার কমায়।
- দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে।
- যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাতৃদুগ্ধ শিশুর নিরাপদ খাদ্য।
- পরিবার পরিকল্পনা সহায়ক হিসেবেও এ দুধের গুরুত্ব অনেক বেশি।
- মাতৃদুগ্ধ পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবেও সাহায্য করে। কারণ এ দুধ আল্লাহ প্রদত্ত। এর জন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না।
- মাতৃদুগ্ধ পানে আচার-ব্যবহার, সামাজিকতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
- মা ও শিশুর মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক ও চিরস্থায়ী আত্মার বন্ধন তৈরি হয়।
- শিশুকে নিয়মিত দুধ পান করালে মায়ের স্তন ও জরায়ু ক্যান্সারের আশঙ্কা কম থাকে।

আসলে মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। তারপরও গরুর দুধে মানবদেহের প্রয়োজনীয় কেজিন ও ল্যাক্টোজ থাকে যা অন্য কোনো খাদ্যে থাকে না। কিন্তু ভেজাল মিশ্রিত কৃত্রিম গুঁড়া দুধ মোটেই কল্যাণকর নয়। এ দুধ খেলে শিশু প্রায়ই অসুস্থ থাকে এবং মৃত্যুর হারও বেশি হয়।

ইসলামে মাতৃদুগ্ধ পান ও শিশুর জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দয়াময় আল্লাহ তায়ালা নবজাতককে মায়ের দুধ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরানে আল্লাহ তায়ালা ১৫ বার মাতৃদুগ্ধ সংক্রান্ত ও মায়ের দুধ পানের কথা উল্লেখ করেছেন। যে নবজাতকের মা শিশুকে দুধ পান করান তার জন্য মাহে রমজানের রোজা পালনের বাধ্যবাধকতা পর্যন্ত শিথিল করে দেওয়া হয়েছে। শিশুকে দুগ্ধ পান করানোর সময়সীমা সম্পর্কে পবিত্র কোরানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে,

মায়েরা যারা তাদের সন্তানদের পুরো সময় দুগ্ধ পান করার ইচ্ছা রাখেন, তারা নিজেদের শিশুদের পুরো দু বছর ধরে দুগ্ধ পান করাবেন'। (সুরা আল বাকারা, আয়াত : ২৩৩)।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু জন্মের পর যত দ্রুত সম্ভব মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এ দুধ শিশুর মস্তিস্কের গঠন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, হাঁড়ে ও দাঁতের সুষ্ঠু গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে খুবই উপকারী। মোট কথা, মায়ের দুধ শিশুদের জন্য সঠিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ খাবার। মায়ের দুধে ৯৫ শতাংশ পানি ও শিশুর প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন চিকিৎসকগণ। তাই শিশুকে প্রতিদিন ৮-১২ বার দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দেন। শিশু যখন কান্না করবে তখনই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। মায়ের সঙ্গে সব সময় শিশুকে রাখতে হবে যাতে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে। মায়ের দুধ খাওয়ালে শিশুরা তুলনামূলকভাবে মেধাবী হয়। যা দেশ ও জাতির কাম্য।

১৯৯২ সাল থেকে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর পক্ষে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। তাসত্ত্বেও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মায়েদের মাতৃদুগ্ধ পানে উৎসাহিত করতে হবে এবং বিকল্প শিশু খাদ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে কর্মজীবী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা বিধানে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি গুঁড়া দুধের পক্ষে রমরমা বাণিজ্যিক প্রচারণা ও নিরুৎসাহিত করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাতৃ ও শিশু পুষ্টি বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে, সার্থক হবে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়করাজ রাজ্জাকের প্রয়াণ

সুলতানা বেগম

নায়করাজ রাজ্জাক। পুরো নাম আব্দুর রাজ্জাক। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল নাম। এদেশের ঘরে ঘরে, প্রতিটি জনপদের প্রিয় নায়ক। বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি ছিলেন কিংবদন্তি, প্রধান স্থপতি এবং অঘোষিত এক মুকুটহীন সম্রাট। তিনি অভিনয়ের মাধ্যমে এদেশের সিনেমাপ্রেমীদের মন জয় করেছেন। কিংবদন্তি এই অভিনেতা ২১শে আগস্ট ২০১৭ না ফেরার দেশে চলে যান তাঁর অগণিত ভক্ত ও অনুরাগীদের কাঁদিয়ে। তাঁর জন্ম ১৯৪২ সালের ২৩শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জে। তাঁর পিতা আকবর হোসেন এবং মাতা নিসারুন নেছা। শৈশবেই তিনি পিতামাতাকে হারান। তারপর ১৯৬২ সালের ২রা মার্চ মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন খায়রুন নেছা (লক্ষ্মী)-কে।

তিনি যখন কলকাতার খানপুর হাইস্কুলে পড়েন তখন শুরু হয় তাঁর অভিনয় জীবন। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় সরস্বতী পূজা চলাকালীন মঞ্চ নাটকে অভিনয়ের জন্য তাঁর গেম টিচার রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁকে নায়ক হিসেবে বেছে নেন। এরপর শিশু-কিশোরদের নিয়ে লেখা নাটক *বিদ্রোহী*তে গ্রামীণ কিশোর চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর পথচলা। সেই নাটকে অভিনয় করে তিনি নামকরা অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের প্রশংসা পেয়েছিলেন। কলেজ জীবনে *রতন লাল বাঙালি* সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর চলচ্চিত্রে প্রবেশ। এছাড়া কলকাতায় তিনি *পঙ্কতিলক* ও *শিলালিপি* নামে আরো দুটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

রাজ্জাক অভিনেতা হওয়ার মানসে ১৯৬১ সালে কলকাতা থেকে মুম্বাই পাড়ি জমিয়েছিলেন। সেখানে সফল না হওয়ায় ফিরে আসেন টালিগঞ্জে। কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কারণে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে চলে আসেন ঢাকায় ১৯৬৪ সালের ২৬শে এপ্রিল এবং কমলাপুরে ভাড়া বাসায় ওঠেন। ঢাকায় তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তখন ঢাকায় তাঁর পরিচিত কেউ ছিল না। তাঁর সঙ্গে তখন ছিল নাট্যকার পীযুষ বসুর চিঠি এবং পরিচালক আব্দুল জব্বার খান ও শব্দযন্ত্রী মনি বোসের ঠিকানা। রাজ্জাক পরিচালক আব্দুল জব্বার খানের সঙ্গে দেখা করেন কাজের জন্য। জব্বার খান তাঁকে আশ্বাস দেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে 'ইকবাল ফিল্মস' প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ করে দেন। এ প্রতিষ্ঠানের ছবি *উজালা*'র পরিচালক কামাল আহমেদের সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর সহকারী পরিচালক হিসেবে দ্বিতীয় ছবি ছিল *পরওয়ানা*। কিন্তু ছবির ৮০ ভাগ শেষ হওয়ার পরই তিনি সহকারীর কাজ ছেড়ে দেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল নায়ক হওয়ার, ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো। তাই হলো। সহকারী পরিচালকের কাজ ছেড়ে *তেরো নাম্বার ফেকু ওস্তাগার লেন* চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। *ডাকবাবু*, উর্দু চলচ্চিত্র *আখেরি স্টেশন*সহ কয়েকটি চলচ্চিত্রে ছোটো ছোটো ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। এক সময় সুন্দর চেহারা আর বাচনভঙ্গির কারণে জহির রায়হানের নজরে পড়েন রাজ্জাক। জহির রায়হান *বেহুলা* চলচ্চিত্রে লখিন্দরের ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ করে দেন তাঁকে। নায়িকা ছিলেন সুচন্দা। এদেশে নায়ক হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র। ছবিটি ১৯৬৬ সালে মুক্তি পায় এবং সুপারহিট হয়। আর রাজ্জাক সুযোগ পেয়ে যান তাঁর আজন্ম স্বপ্ন পূরণের। এছাড়া তিনি ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশনে *ঘরোয়া* নামের ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেন এবং দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হন।

রাজ্জাক শুধু অভিনেতাই ছিলেন না, মানুষ হিসেবেও ছিলেন মহান। শিল্পী হিসেবে ছিলেন উচ্চমাপের। তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল চলচ্চিত্র সম্পর্কে। একাধারে তিনি প্রযোজক, পরিচালক হিসেবেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কলকাতা থেকে আসা সেই যুবক এক সময় হয়ে ওঠেন বাংলা চলচ্চিত্রের রাজপুত্র। বাংলা চলচ্চিত্রের পত্রিকা *চিত্রালী*র সম্পাদক আহমদ জামান চৌধুরী তাঁকে 'নায়করাজ' উপাধি দেন। তিনি বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে প্রায় ৩ শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রসমূহ হচ্ছে– *আনোয়ারা*, *সুয়োরানী দুয়োরানী*, *দুই ভাই*, *মনের মতো বউ*, *ময়নামতি*, *ক খ গ ঘ ঙ*, *বেঈমান*, *ছুটির ঘণ্টা*, *রংবাজ*, *নীল আকাশের নীচে*, *জীবন থেকে নেয়া*, *পিচ ঢালা পথ*, *অশিক্ষিত*, *বড়ো ভালো লোক ছিল*, *স্বরলিপি*, *কি যে করি*, *টাকা আনা পাই*, *অনন্ত প্রেম*, *বাদী থেকে বেগম*, *আনারকলি*, *বাজিমাত*, *লাইলি মজনু*, *নাতবউ*, *মধুমিলন*, *সাধু শয়তান*, *মাটির ঘর*, *দুই পয়সার আলতা*, *কালো গোলাপ*, *নাচের পুতুল*, *আলোর মিছিল*, *আবির্ভাব*, *দ্বীপ নেভে নাই*, *চন্দ্রনাথ*, *শুভদা*, *রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত*। তাঁর সর্বশেষ অভিনীত ছবি বাপ্পারাজ পরিচালিত *কার্তুজ*। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। নায়ক হিসেবে অভিনীত তাঁর শেষ ছবি *মালামতি*। নায়িকা ছিলেন নূতন। চরিত্রাভিনেতা হিসেবে অভিনয় করেন ১৯৯৫ সাল থেকে। রাজ্জাক চলচ্চিত্র পরিচালনায়ও সফলতা অর্জন করেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র *অনন্ত প্রেম*। ১৯৭৭ সালে মুক্তি পায়। তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি *আয়না কাহিনী*, মুক্তি পায় ২০১৪ সালে। তিনি সব মিলিয়ে ১৬টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালিত অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলো হচ্ছে– *জ্বিনের বাদশা*, *বাবা কেন চাকর*, *আমি বাঁচতে চাই*, *কোটি টাকার ফকির*, *মন দিয়েছি তোমাকে*। তিনি অভিনয় ও পরিচালনার পাশাপাশি ১৯৭৬ সালে *আশঙ্কা* ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ২০টি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম 'রাজলক্ষ্মী'। চলচ্চিত্র অঙ্গনে তিনি শুধু তাঁকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁর দুই ছেলে বাপ্পারাজ এবং সম্রাটও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

নায়করাজ রাজ্জাক চলচ্চিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসহ অনেক সম্মাননা। ১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৩ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-এ তাঁকে 'আজীবন সম্মাননা পুরস্কার' প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার সংস্কৃতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করে। তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বাচসাস পুরস্কার, মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তাঁর সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি ছিল– জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে কাজ করা।

রাজ্জাক শুধু একজন গুণী অভিনেতা ছিলেন না, আপাদমস্তক চলচ্চিত্রের একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর মতো এত বড়ো মাপের মানুষকে হারিয়ে চলচ্চিত্র শিল্প অনেক কিছু হারালো। শুধু তাই নয়, এই উপমহাদেশ তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এক মহান শিল্পীকে হারালো। তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের এবং ভক্তদের মহায়নায়ক ছিলেন, আছেন এবং চিরকাল বেঁচে থাকবেন সবার অন্তরে।

লেখক: সিনিয়র সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

কাশের বনে লাগলো হাওয়া

মঈনুল হক চৌধুরী

আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এই ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য প্রতিনিয়তই আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। এখানে প্রত্যেক ঋতুতে প্রকৃতির রূপ হয় ভিন্ন ভিন্ন। তার মধ্যে থাকে আলাদা আমেজ, আলাদা সৌন্দর্য। ঋতুর প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রারও পরিবর্তন ঘটে স্বাভাবিকভাবে। স্নিগ্ধতার আমেজ নিয়ে আমাদের দেশে এখন চলছে শরৎ কাল। শরৎকে বলা হয় ঋতুর রানি। কারণ শরৎকালই বর্ষার সৌন্দর্যকে সাদরে গ্রহণ করে অপরূপ সাজে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। বর্ষার হালকা মেঘ শরতের নির্মল আকাশে সাদা সাদা পাল তুলে মনের আনন্দে ভেসে বেড়ায়। দিনের বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রোদে গ্রাম-বাংলার মাঠঘাট, নদীনালা, জলাশয় ঝলমল করে। শরতের এমন ভোলানো রূপ সত্যিই অতুলনীয়। উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে শরৎ ঋতু শুরু হলে রাজরাজড়ারা যুদ্ধ জয়ে বেরিয়ে পড়তেন। অশ্বারোহী সৈন্য থাকত রাজার সাথে। বুকে থাকত বিজয়ের নেশা। শরতের সৌন্দর্য তৎকালীন শাসকদের হৃদয়কে প্রভাবিত করেছিল। বাংলাদেশের ঋতু পরিক্রমায় শরৎকালের আছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফুল, ফল, আর ফসলের দেশ বাংলাদেশের এই ঋতু সবার মনেই আনন্দের সঞ্চার করে। বাংলা ভাদ্র-আশ্বিন এই দুই মাস শরৎকাল। শরৎ অত্যন্ত মনোরম ঋতু। বর্ষার একটানা অস্বস্তির পর স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে আসে শরৎ। শরতের পবিত্রতার কাছে সবাই তাই হার মানে। শরতের প্রশংসা না করে কেউ থাকতে পারে না। শরতের আবেদন তাই প্রতিটি মানুষের কাছে আদরণীয়। দেশের মাটি আর মানুষের সাথে গভীরভাবে মিশে আছে শরৎ। মিশে আছে প্রকৃতির সাথে একইভাবে। প্রকৃতির সাথে শরতের সুনিবিড় সম্পর্ক আর বোধহয় অন্য কোনো ঋতুতে এতটা দেখা যায় না। শরতের গ্রাম-বাংলা যেন আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। স্বপ্নের মতো মায়াবী আর ছবির মতো ঝকঝকে। এত মায়া এত মমতা এত ভালোবাসার ঢেউ অন্য ঋতুতে পাওয়া কঠিন। শরৎ তাই সুন্দরের ডালা সাজিয়ে আমাদের গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিকে উদার হাতে বিলায়। কাশবন সেই দৃশ্যের কোমল ছবি। কাশবনে উড়ে যায় নীল, লাল প্রজাপতি। আরো আছে বেগুনি, হলুদ আর কালো ধূসর রাঙা প্রজাপতি। শরৎ পাখির পাখায় কম্পন জাগায়। ফুলের মাঝে আনে স্পন্দন। এ সময় বাতাস থমকে দাঁড়িয়ে যায়। অবাক চোখে দেখে ফুল ও প্রজাপতির সুখ। কাশবনে ছুটে আসে মৌমাছি। দারুণ পিপাসা নিয়ে বুকে। তবুও গান করে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সে গান। বাতাস ফেরি করে গানের বাণী। শরতের সাথে প্রকৃতির ভালোবাসা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে। রূপে-গুণে সৌন্দর্যের তুলনা হয় না বলেই শরৎ রূপের রানি।

নদীর ধারে, কাশের বনে, বাতাসের দোলায়, শরতের আগমন যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরো সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে তোলে। সবুজ ঘাসের বুকে শিশিরের বিন্দু শরতের উপস্থিতির ছোঁয়া দিয়ে যায়। শরৎকে পেয়ে প্রকৃতি আরো সবুজ ও সজীব হয়ে ওঠে। শরতের এই সবুজের বুকে আরো সবুজের আস্তরণ ছড়ায় ধানের গাছগুলো। মৃদু বাতাসে নেচে তারা মনের আনন্দ প্রকাশ করে এই শরৎকালে। কচি ধানগুলো আরো সবুজ হয়। আশ্বিনের শেষে চাষির মুখে ফুটে উঠবে হাসি। কৃষকের দামাল শিশুরা ধানের গন্ধ গায়ে মেখে উঠোনে গড়াগড়ি যাবে। ধান পাকবে হেমন্তে। শরৎ সেই হৈমন্তিক বাণী শোনায় কৃষকের কানে। শরতের ভোরে কৃষক ধানের জমির আল ধরে হেঁটে যায়। কৃষকের পায়ে শিশিরভেজা

শরতের আকাশ

ঘাস আর শরীরে ধানগাছের পাতা পরশ বুলায়। এ পরশ তার মনে সুখের আমেজ আনে। শরতের ভোরে শিশিরে ধুয়ে যায় মাঠঘাট-পথ-গাছপালা। মনে হয় প্রকৃতি যেন সারারাত স্নান করেছে। মুক্তোর মতো ঘাসের ডগায় সূর্যের আলতো কিরণে ঝলমল করে ওঠে শিশির বিন্দু। শিউলি ফুলের পাপড়িতে কেঁপে ওঠে শরতের ভোর। সারা আকাশজুড়ে মেঘেদের ওড়াওড়ি। মেঘগুলো যেন উড়তে উড়তে কাত হয়ে যায়। ঢুকে যায় একদল থেকে আরেকদলে। কখনো উধাও হয়ে যায়। হারিয়ে যায় শূন্য থেকে। কোনো কোনো মেঘদল নেমে আসে দিগন্ত ছেড়ে। নেমে আসে পাহাড়ের ঢালে। উল্লেখ্য, শরতের আকাশ গাঢ় নীল। সাদা মেঘের ওপাড়ে নীলের গ্রাম। তাই শরতের আকাশভরা নীলে জেগে ওঠে সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে বিছানা পাতে নীল। লোনা আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার জেগে ওঠে ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে। শরৎ দাঁড়িয়ে থাকে বকুলতলায়। ঝরে পড়া বকুলেরা দেখে। বকুলের সৌরভ মেখে নেয়। মেখে নেয় হাতে-মুখে-গায়ে। শরৎ সুবাসিত হয়। এক সময়ে পূর্ব আকাশ উজ্জ্বল করে সূর্য ওঠে। সকাল পেরিয়ে গড়িয়ে আসে শরৎ দুপুর। বকুল ছায়ায় ভিজিয়ে নেয় শরৎ দুপুর। শরৎ দুপুরের আলোয় ঘাস, ধান, বাঁশঝাড়, খড়ের চালে জমে থাকা শিশির বিন্দুগুলো শুকিয়ে যায়। শরতের দুপুর বড়োই নির্মল। নীলের গভীরতা বেড়ে যায় আকাশে। সাদা হালকা মেঘ আনমনে উড়ে যায়। ওড়ে দক্ষিণা দিগন্ত ছেড়ে। নীরব পাখা মেলে ওড়ে সাদা চিল। মেঘের কাছাকাছি ডানা মেলে শিকারি ঈগল। কোথায় লুকিয়ে আছে তার শিকার। শরতের দুপুর খানিকটা দক্ষিণে বেঁকে যায়। ধীরে ধীরে ছোটো হয়। তারপর হেঁটে যায় বিকেলের দিকে। শরতের বিকেল আরো মায়াবী। রোদ নিজেকে অনেকটা শীতল করে নেয়। সবুজ গাছগাছালি রোদ খেয়ে খেয়ে বেশ তাজা হয়ে ওঠে। কলাপাতার গায়ে রোদের সাথে কাত হয়ে থাকে শরৎ। ফলে বনানীর মতো মাঠও সবুজ হয়ে ওঠে। একসময় মাঠভরা ধানের সবুজে গড়াগড়ি করে শরৎ বিকেল। শরৎ সন্ধ্যা এসে দাঁড়ায় লালিমার নিচে। লাল-কমলায় রাঙা হয় শরতের মুখ। শরৎ সন্ধ্যায় জমে ওঠে কবিতার আসর। গানের জলসা। পাখিদের গানে গানে শরৎ সন্ধ্যা প্রবেশ করে রাতের ঘরে। ঝিরঝির বাতাস হাত বুলিয়ে যায় প্রকৃতির গায়ে। সেই আরাম নিয়ে আসে শরতের রাত। পাখিরা চোখ বোজে, চোখ বোজে প্রকৃতির গাছেরা। ধীরে ধীরে শরৎ হাঁটে রাতের দিকে। রাতের শরৎ মানে ভেজা ভেজা ঘুম। ঘুম ঘুম তারা জ্বলা রাত। রাতভর জেগে থাকে জোনাকি। শরৎ রাতের গায়ে জোনাকিরা খেলে যায়। শরতের রাত বড়ো মজার রাত । না ঠান্ডা, না খুব দীর্ঘ, না খুব ছোটো। শরৎ রাতে আকাশে দেখা দেয় ঘন তারকার বন। রাতভর, সারারাত। একটানা জ্বলে। জ্বলতে জ্বলতে কত তারা নিভে যায়।

নিভতে নিভতে আবার জ্বলে। কোনো কোনোটি দূর থেকে কাছে আসে, কোনোটি আবার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। যেতে যেতে চোখের আড়াল হয়ে যায়। এভাবে কত তারা জ্বলে আর কত তারা নেভে, কে রাখে তার খবর! শরতের মধ্য রাতে আকাশে জমে তারার মিছিল। শরতের পূর্ণিমা রাতে জ্যোস্নায় মন ভরে ওঠে। এ সময় মেঘমুক্ত রাতের আকাশে চাঁদ তার প্রাচুর্য উজাড় করে ঢেলে দিয়ে আকাশে ভাসে। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য! যা ভোলার নয়। শরতের জোছনা শ্রাবণের মতো স্বচ্ছ থাকে না। ধোঁয়া মিশিয়ে নামে জোছনারা। কুয়াশা কুয়াশা রাত, কুয়াশায় মাখা চাঁদ। শরতের রাত বেয়ে পাখিরা উড়ে যায় ভোরের দিকে। সেই ভোর নেমে আসে আকাশ ছুঁয়ে। সেই আকাশই হয়ে যায় শরৎ সুদিন। শরৎ উৎপাদনের ঋতু। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে বর্ষায় জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও বর্ষার কোনো বিকল্প নেই। বর্ষার অবিরাম বর্ষণ আর খাল-নদী-বিল ছাপিয়ে আসা পানি অবারিত সবুজের মাঠ প্লাবিত করলেও পানি নামার সময় থেকে যায় স্তরে স্তরে পলি। যে পলিতে কৃষক বোনে তার আগামীর স্বপ্ন। তার স্বপ্নজুড়ে থাকে সবুজ ফসলে ভরা দিগন্তজোড়া ক্ষেত। তাই বর্ষার উর্বর মাটিতে সবুজ সোনা ফলাতে আসে শরৎ। শরৎ এলে বৃক্ষরাজির আড়ালে আবডালে থাকা পাখিরা নুতন প্রাণের স্পন্দনে জেগে ওঠে। নানা গায়ক পাখির গানে মুখরিত হয়ে ওঠে শরতের পরিবেশ। এ সময় আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েল, কোয়েল, বুলবুলিসহ সকল পাখি গান করে। বিশেষত শরৎকালে দোয়েল পাখির শিস শুনতে কী যে ভালো লাগে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শরতের এই স্নিগ্ধ শোভাকে আরো মোহনীয় করে এই মৌসুমের বিচিত্র ফুলেরা। নদী কিংবা জলার ধারে ফোটে কাশ-ফুল, ঘরের আঙিনায় ফোটে শিউলি-শেফালি, খাল-বিল-পুকুর-ডোবায় থাকে অসংখ্য জলজ ফুল। শিশির ভেজা শিউলি বাতাসে মৃদু দোল খাওয়া কাশবনের মঞ্জরি, পদ্ম-শাপলা-শালুকে আচ্ছন্ন জলাভূমি শরতের চিরকালীন রূপ। আমাদের অন্যান্য ঋতুগুলো অনেক ফুলের জন্য বিখ্যাত হলেও মাত্র কয়েকটি ফুল নিয়ে শরৎ গরবিনী। তাই কাশ-শিউলির শোভা উপভোগ করতে হলে আমাদের শরতের কাছে যেতে হবে। বসন্তের পর শরৎ ছাড়া এমন কোনো ঋতু নেই যা ছোটো– বড়ো সকলের মনে দোলা দিতে পারে। শরতের সুখ মেখে এভাবেই কাটে এ দেশের মানুষের জীবন।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

রংধনু

জামিউর রহমান লেমন

দুপুরের ট্রেনটা একরাশ ধুলো উড়িয়ে প্রচণ্ড শব্দ তুলে চলে গেল। কিছু ধুলো উড়ে এসে রাইসার চোখ–মুখ ঢেকে দিল। রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে একদল ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে তাই দেখে হই হই করে উঠল। দু-একজন রেলের শেষ বগিটাকে লক্ষ করে নুড়ি পাথর ছুড়ে মারল। ঘটনাটা নিত্যদিনের হলেও আজ একটু অন্যরকম লাগছে রাইসার। মাত্র কদিন বাকি ঈদের। মা সেই কখন কাক ডাকা ভোরে কাজে বেরিয়েছে রাইসা বলতে পারে না। দশ বছরের রাইসার জীবনে কখনো মার সাথে বসে সকালের নাস্তা বা দুপুরের খাওয়া কোনোটাই হয়নি। বাবা নামের প্রাণীটির সাথে কোনোদিনও দেখা হয়নি রাইসার। মার কাছে শুনেছে বাবার কথা। রাইসা মগবাজার রেললাইনের সাথে লাগানো বস্তির ঝুপড়িতে বসে কল্পনায় বাবার ছবি আঁকে। রাইসা ভাবে আর ভাবে। আহা এখনকার মতো তখন যদি মোবাইল ফোনটা থাকত তাহলে হয়ত বাবার ছবিটা তুলে রাখা যেত। মা যে বাসায় কাজ করে সে বাসার বড়ো সাহেব, বেগম সাহেব একেবারে কঠিন প্রকৃতির মানুষ। সবকিছু মেপে মেপে করেন। তবে ঐ বাসার ছোটো ভাইয়াটা অন্য কিসিমের। রাইসার মাকে সে একটা পুরোনো মোবাইল সেট দিয়েছিল। কারণটা হলো তাকে স্কুলে আনা-নেওয়ার সময়টা যাতে ঠিক থাকে। মোবাইলটি সময়-অসময়ে যখন শব্দ করে বাজে তখন রাইসার বেশ ভালোই লাগে। মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করে ঐ যন্ত্রটা কানে দিয়ে কারো সাথে কথা বলতে। কিন্তু কার সাথে কথা বলবে– সেটা রাইসা ভেবেই পায় না।

রেললাইনের পাশে একটা ভাঙা টুলে বসে চা বিক্রি করে পাশের ঝুপড়ির রহিমা খালা। ছোটো-বড়ো সবাই তাকে রহিমা খালা বলেই ডাকে। তিব্বত স্নো ,সস্তা লিপস্টিক আর ফিতে-চুড়ি পরে রহিমা খালা ফ্লাস্কে করে চা বিক্রি করে প্রতিদিন। দিনের চেয়েও তার রাতের কাস্টমার বেশি। কারণটা হলো বিকেল থেকে শুরু হয় দৈনিক কাজকাম সারা পুরুষদের ঝুপড়িতে ফেরার পালা। দিনমজুরির টাকার ছোট্ট একটা অংশ সবাই রাখে প্রতিদিন চা–পান–বিড়ির জন্য। সন্ধ্যে হলে রেললাইনের পাশে গোল হয়ে বসে তারা রহিমা খালার বানানো ফ্লাস্কের চা খায়। ঠাট্টা মশকরা করে। কীসব হাবিজাবি বলে। এসবের কোনোকিছুই বুঝতে পারে না ছোট্ট রাইসা। মাঝেমধ্যে তার ইচ্ছে করে বড়ো হয়ে রহিমা খালার মতো এই রেললাইনের পাশে চায়ের দোকান দেওয়ার। তার মাত্র দুটো জামা আর একটা সালোয়ার ও একটা হাফ প্যান্ট। তাও তলাটা ছিঁড়ে গেছে, তালি না দিলে আর পরা যাচ্ছে না।

অথচ রহিমা খালা প্রতিদিনই নতুন নতুন শাড়ি-ব্লাউজ পরে। মাঝেমধ্যে মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হয় রাইসার। এত খাটাখাটনি না করে যদি রহিমা খালার মতো একটা দোকান দিত তাহলে হয়ত, একটা ঈদ তার বেশ আনন্দেই কাটত। নতুন জামা, স্যান্ডেল, চুড়ি, ফিতা সবকিছু কিনতে পারত।

কিরে ঘুমাসনি–

রহিমা খালার ডাকে ঝুপড়ির ভাঙা চৌকি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় রাইসা।

এই ভরদুপুরে কেমতে ঘুমোয় খালা। ঘুম আহে না–

কেমনে আইবো, পেটে খাওন থাকলে দিলে শান্তি থাকে, ঘুম তহন এমনেই আসে–

রহিমার খালার কথা শুনে বড্ড রাগ হয় রাইসার, রাগ হয় মায়ের ওপরেও। রহিমা খালার কোনো ছেলেপুলে নেই। সময় পেলেই রাইসাকে নিজের কাজে লাগিয়ে দেয়। দু-চার টাকা হাতে গুঁজে দেয়। বেশ ভালোই লাগে রাইসার। নিজের কামাই করা পয়সার মজা অন্য রকম। সেই পয়সা দিয়ে লাঠি লজেন্স, বাটার বন, বরফ আইসক্রিম– সবকিছুই কিনে কিনে খায় রাইসা। মায়ের কড়া নির্দেশ রহিমা খালার কোনো কাজে রাইসা যেন না যায়। কেন এই শাসন তার কোনোকিছুই বুঝে উঠতে পারে না রাইসা। তবুও মায়ের চোখ এড়িয়ে রহিমা খালার ফাই- ফরমাস খেটে দেয় রাইসা। খাটলেই দুই-তিন টাকা, কম কি। একবার হয়েছে কী রাইসার মা হঠাৎ করে কী একটা কাজে বিকেলের আগে ঝুপড়িতে ফিরেছেন। রাইসা তখন রহিমা খালার চায়ের দোকানে কাপ-পিরিচ এগিয়ে দেওয়ায় ব্যস্ত। সেখান থেকে চুল ধরে টেনে এনে তার মা যে পিটুনি তাকে দিয়েছিল সেটা ভাবলে এখনো রাইসার চোখ পানিতে ভরে যায়।

সেসময় রহিমা খালার উদ্দেশে মায়ের বলা কথাটা রাইসার মনে আছে–

'না খাইয়া থাকন ভালা- আমার মাইয়্যারে আমি মাতারি হইতে দিমু না'।

কথাটা শুনে রহিমা খালা মুখে পান গুঁজে দিয়ে খিলখিল করে হেসেছিল। এসবের কোনো মানে বুঝতে পারে না ছোট্ট রাইসা। সেই রাতে রাইসার প্রচণ্ড জ্বর উঠে। সারারাত ঝুপড়ির মধ্যে ছটফট করে রাইসা। পরের কথাটি মায়ের মুখে শোনা। শেষ রাতে যখন শরীরে খিঁচুনি উঠে যায়, বেহুঁশের মতো পড়ে থাকে তার ছোট্ট দেহ। মায়ের কান্নার শব্দে সারা বস্তির লোক জড়ো হয়ে যায়। কেউ কোনো ঔষধ পথ্য, ডাক্তারের কথা বলে না। কেউ কেউ বলতে থাকে–

'তর মাইয়্যাটা মারা যাইব রে' হঠাৎ রহিমা খালা পাগলের মতো দৌড়ে আসে– বলে–

বুবুগো আমার রাইসার কথা তুমি আমারে জানাও নাই ক্যান, এই দুইন্যাতে হগলতে খালি কথা বলতে জানে, কাইজ্যা লাগাইতে জানে, জীবন বাঁচাইতে জানে না। এখন কও তোমার কাছে ঔষধের টাকা আছে! ডাক্তারের টাকা আছে! নাই। এখন এই মাতারি খালাই আল্লা চাইলে তোমার রাইসারে বাঁচাইতে পারব।

আপনারা কি মাইনসের বাচ্চা, একটা ছোট্ট মাইয়া জ্বরে কাতরাইতেছে, বেহুঁশ হইয়া পড়ছে– বিশ-পঞ্চাশ ট্যাকা খরচ কইরা তারে হাসপাতাল নিতে পারতাছেন না। অথচ রহিমা খালার হাতে চা খাওনের সময় ঠিকইতো তিন ট্যাকার চা পাঁচ ট্যাকা দেন। থুঁ...

রাইসার মায়ের মনে হয়েছিল এই থুঁ টা যেন তার মুখের ওপর ফেলে গেল রহিমা খালা। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে মগবাজার আদদ্বীনে ছুটে গিয়েছিল রহিমা খালা। জন্ডিস আর টাইফয়েডে একমাস ভুগে রাইসা এখন বেশ ভালো। প্রায় দুপুরে–বিকেলে–মাঝ রাতে রহিমা খালা ছুটে আসে রাইসাকে দেখতে। এখন যেমন এসেছে।

তোর মায়ে কি আমারে অহনো মাতারি বইল্লা ডাহে–

জাইন্না... মাতারি কিগো খালা–

জানি না গো বইন– ঢাকা শহরে আইসা কত্তো কিছু যে শিখলাম, তয় একটা কথা কিন্তু তোরে বলিরে সোনা– কী কথা- ব্যাঙ্গের মাথা- কী ব্যাঙ্গ-সোনা ব্যাঙ্গ- কী সোনা– মাছের পোনা- কী মাছ- টাকি মাছ।

খালাগো টাকি মাছের ভর্তা নাকি অনেক মজা, আমারে টাকি মাছের ভর্তা দিয়া ভাত দিবা।

ওমা কিসের মইধ্যে কী, তোরে একটা কথা বলি, মাতারিগো কিন্তু এই শহরে সবতে ডরায়।

তাহইলে আমিও মাতারি হমু খালা!

নাগো মা তোরে আমি মানুষ বানাইতে চাই–

কী যে কও, আমি কি গরু ছাগল-নি।

না-রে সোনা, এই শহরে যাগো ক্ষেমতা আছে, হেরা মাতারি হইলে কেউ তাগো মাতারি বলে না, অথচ আমগো কিচ্ছু নাই রেললাইনের ঝুপড়িতে থাহি, খাইট্টা খাই– তাও সবতে কয় মাতারি-যাউকগা–

আমিতো তোমারে খালা ডাক পাড়ি- কও ডাকি না?

তুইতো আমার সোনা মানিক, শরীলডা অহন বেশ ভালোতো- কাইল তোরে সুপ খাওয়ামু।

সেইটা আবার কী?

শরীরে বল আসে, খাইলেই বুঝবি

তোর মা আসলে কইস, মাতারি খালা দেখা করতে বলছে।

রহিমা খালার এই শেষ কথাটি শুনে প্রথমবারের মতো কেঁদে ফেলল রাইসা। সে বেশ বুঝতে পারল মাতারি কথাটি ভালো কোনো কথা না।

পাশের ঝুপড়ির আক্কাস আলী কাশি দিতে দিতে রাইসার পাশে এসে বসে।

আক্কাসের পান খাওয়া তরমুজের বিচির মতো দাঁত দেখে বড়ো ঘেন্না হয় রাইসার। ঘেন্নাটা তখন আরো বাড়ে যখন মনে হয়, একদিন যখন আক্কাস তার মাকে বলছিল–

কিরে জমিলা জীবনটা কি এমনি কইর‍্যা পার কইর‍্যা দিবি। আমি তো রাইসার বাপ হইতে পারি কী পারি না, রাইসা তখনই উঠে গিয়ে বিছানার নীচে থাকা ভাঙা আয়নায় তার চেহারাটা বার বার দেখছিল। মাকে প্রশ্ন করেছিল–

আমার বাবার চেহারাটা তো ঐ শয়তানের মতো হইতে পারে না মা–

মা কোনো উত্তর না দিয়ে রাইসাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদেছিল। এই কান্নার কোনো মানে বুঝতে পারেনি রাইসা।

হাসতে হাসতে আক্কাস বলে,

আমগো হগলতের দোয়ায় তুই এযাত্রা বাঁইচা গেছস-

শুনছি আপনে তো পাশের ঝুপড়ি থাইক্কাও হেই দিন দেখতে আসেন নাই-

ঐ হইছে-ভিতর থাইক্কা দোয়া করছি।

বিশ্বাস করি কেমতে- এক মাসে একদিনও হাসপাতাল গেলেন না, ঔষধ-পথ্যি কিছুই আনলেন না, যা কিছু দিছে ঐ রহিমা খালা–

ঐ হইছে- তোর রহিমা খালারে আমিতো ডাবল ট্যাকা দেই। এক কাপ চা দশ ট্যাকা, আমার ট্যাকায় তো সে তোর জন্যে ঔষধ-পথ্যি কিনছে–

রহিমা খালারে জিগামু সে তোমার ট্যাকা কেন নিছে–

ঐ হইছে– আমার ট্যাকা-তোমার ট্যাকা-তোমার ট্যাকা-আমার ট্যাকা- আমার ট্যাকা-সবার ট্যাকা তুমি– এইসব বুঝবা না। হুন রাইসা, আমারে তুমি বাপজান ডাকবার পারো, তাতে লাভ আছে। এই ট্যাকাটা রাখো, তুমি আর তোমার মায়ে মিইল্লা ঈদে ভালো মন্দ খাইও-

চকচকে একশ টাকার নোট জীবনে এই প্রথম হাতে ধরে দেখল রাইসা। প্রায় দিন যখন সে দোকানে ফুটফরমাস খাটতো তখন রহিমা খালা তাকে চিনিয়ে দিত, এই যে মা এটারে কয় পাঁচ ট্যাকা,ওটারে দশ ট্যাকা, এইটা একশ ট্যাকা। একবার শাড়ির ভাঁজ থেকে একটা বড়ো নীল নোট বার করে দেখিয়েছিল। নোটের এক কোণায় একটা মানুষের ছবি।

ট্যাকায় আবার মাইনষ্যের ছবি। আমগো ছবি থাকব না।

রহিমা খালা হেসে বলেছিল,

থাকবোরে মা, দেশের জন্যে যারা ভালো কাজ করে তাদের ছবি ট্যাকায় থাকেগো মা–

তখন সে জেনেছিল ছবিটি শেখ মুজিবুর রহমানের। রহিমা খালা, মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা আরো কত কিছু বলেছিল। যার কোনো মানেই সে বুঝতে পারেনি।

আক্কাস আলী চলে যাওয়ার পর থেকেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় রাইসার। বাবা নামের একজনকে দেখার-চেনার জন্য তার মন আনচান করে উঠে। মনটা চায় রহিমা খালার দোকানে গিয়ে একটু আধটু কাজ করতে। রোজার সময় সন্ধ্যার পরেই খালার দোকানটা বেশ জমে। রাইসার বিশ্বাস এখন রহিমা খালার দোকানে বসলে তার মা জমিলা বেগম আর বকাঝকা করবে না। ইচ্ছে থাকলেও রাইসা যেতে পারছে না। দুর্বল শরীর তাতে বাঁধ সাধে।

হঠাৎ ঝমঝমিয়ে এক পসলা বৃষ্টি রেললাইনসহ পুরো ঝুপড়িগুলো ভিজিয়ে দিয়ে গেল। কদিন পরে ঈদ, নতুন জামা না হোক অন্তত পুরোনো কিছু সে পাবেই। কেউ না দিক রহিমা খালাতো দিবেই। এই ভাবনা ভেবে আনন্দে মনটা একেবারে ভরে উঠছে। হাতের ভাঁজে থাকা আক্কাসের দেওয়া একশ টাকার নোটটা তার কাছে একটা জ্যান্ত সাপের মতো মনে হলো। মনে হলো সাপটা ফণা তুলে তাকে ছোবল মারতে চাইছে। রাইসা একটা পাথরে টাকাটা পেঁচিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় রেললাইনে। আস্তে আস্তে ঝুপড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায়। বৃষ্টির পর আকাশে তখন রংধনু উঠেছে। রাইসা দুচোখ ভরে তা দেখছে আর আনন্দে ভেসে যাচ্ছে। আহা এই আকাশে যিনি রংধনু উঠিয়েছেন তিনি তাহলে কত না সুন্দর। তার ছোট্ট মনে ভাবনার ঘুড়ি উড়ে উড়ে কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে গেছে সে বুঝতে পারেনি।

মারে তোরে ঝুপড়িতে না দেইখ্যা ভয় পাইছিলাম, দুর্বল শরীলে এত্তো দূর আইছোস ক্যান।

মায়ের ডাকে চমকে উঠে রাইসা। রাইসার কাঁধে হাত দিয়ে জমিলা বলে,

দুদিন পরে ঈদ, বেগম সাহেবে বলছে এইবার ছোটো ভাইয়ার পুরান জামা-প্যান্ট জুতা সবগুলাই তোরে দিবো। পুরান হইলে কি হইবোরে মা -হেগো বাড়ির সবকিছু এক্কেবারে নতুনের চাইয়াতে বেশি। ঝুপড়ির মাইনষে টেরই পাইবো না।

আমি কি তোমার পোলা মা– যে পোলা মাইষ্যের ডেরেস পরমু।

তুই হইলি আমার পোলা-মাইয়্যা সবটি।

আক্কাস কাকা আসছিল, একশ ট্যাকা দিছে-

কী করছোস?

মারবা নাতো?

মারমু ক্যান ক কী করছিস।

ফালায় দিছি- ডুকরে কেঁদে উঠল জামিলা বেগম। মনে হলো সারা আসমান ভেঙে পড়ছে তার মাথায়। এতটুকু মেয়ে কী করে বুঝল তার মায়ের ঘৃণার কথা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মোবারকের ছবি। হতদরিদ্র পরিবারের অভাবের কারণে ভাগ্যের সন্ধানে তারা দুজনে চলে এসেছিল এই ঢাকা শহরে। মোবারক দিনে রিক্সা চালাতো আর জমিলা মগবাজার নয়াটোলায় ছুটা বুয়ার কাজ করত। ঝুপড়ির ভাড়া মাসে পঞ্চাশ টাকা মেটাতে তাদের কোনো কষ্ট হতো না। মোবারক প্রায় রাতে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলত–

'বউ তুই দেখবি আমগো জীবন ফিরবো, আমরা বাসা ভাড়া নিয়া সাহেবগো মতো থাকমু, আমগো একটা মাইয়া হইবো, হেয় পড়া লিকা করবো, তাক আমি ডাক্তারি পড়ামু'।

স্বপ্নে বিভোর হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে ভোর হয়ে যেতো তারা বুঝতে পারত না। এভাবেই দিন ভালোই কাটছিল। হঠাৎ একদিন বস্তি সর্দার আক্কাসের নজর পড়ে জমিলার ওপর। সেই থেকে ভুল বুঝাবুঝি। শুরু হয় টানাপড়েন। পেটে আসে রাইসা। বিশ্বাস–অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে তাদের ভালোবাসার বন্ধন প্রায় ছিন্ন হতে চলেছিল।

হঠাৎ একদিন ভোররাতে– তখন প্রায় ফজরের আজান পড়ার সময় হয়েছে, ভোরের ট্রেন বিকট শব্দে তাদের ঝুপড়ির সামনে থেমে যায়। শব্দে জমিলার ঘুম ভেঙে যায়। সে দেখে রেল পুলিশের লোকজন ব্যস্ত হয়ে কিছু একটা খোঁজা খুঁজি করছে। জমিলার বুকটা ধড়ফড় করে উঠে। পেছনে চেয়ে দেখে মোবারক বিছানায় নাই, এসময় সাধারণত সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রেললাইনের ধারে যায়। হঠাৎ জমিলা শুনতে পায় যে, দূর থেকে কে একজন চিৎকার করে বলছে,

আমগো ঝুপড়ির মোবারক কাটা পড়ছে-

বাঁদিকে চেয়ে দেখে টর্চ হাতে আক্কাস মিয়া অনেক দ্রুত পাশের ঝুপড়িতে ঢুকছে। ঘটনাটা বুঝতে বাকি রইল না জমিলার। সেই থেকে শুরু একলা পথ চলা। নিজেকে আগলে রাখা।

ট্যাকা ফালায় দেওয়ায় তুমি কি কষ্ট পাইছো মা?

খুশি হইছি–

মাগো আইজ বৃষ্টি হইছিল, তুমি কি দেখছো–

হেগো বাসায় এসি আছে, চারদিক বন্ধ, দেখমু কেমতে মা-

আইজকা রংধনু উঠছিল- মাগো, আমার বাপজান কি রংধনুর মতো সুন্দর আছিল?

নারে মা, সে হের চাইতেও সোন্দর আছিল-

মাগো এইবারের ঈদটা আমরা রহিমা খালার লগে একসাথে করমু-মা, তুমি হেরে আর মাতারি বইলো-না, কেমন?

রাইশা-র হাত ধরে জমিলা এগিয়ে গেল রেললাইনের সেইখানে যেখানে মোবারকের রক্তের ছোঁয়ায় রেললাইনের পাশের ঘাসগুলো এখনো লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে।

লেখক: গীতিকার এবং সাবেক উপপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

ঠিকানা : বৃদ্ধনিবাস

নাসিম সুলতানা

নাসরিন ভাবছে কেমন করে কাটাবে এই বৃদ্ধনিবাসে। এক অজানা-অচেনা পরিবেশ। কিছুই ভালো লাগছে না তার। আজ কয়েকদিন হলো তার এখানে থাকার জায়গা হয়েছে। এটাই কি তার ভাগ্য ছিল?

কী না ছিল তার? বাবা-মা'র আদরের সন্তান ছিল সে। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সে বড়ো। লেখাপড়া শেষ করার পর ভালো পরিবারের ব্যবসায়ী ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হলো। বাবা'র তরফ থেকে একটি ফ্ল্যাটও সে পেয়েছিল।

ভালোই কাটছিল দিনগুলো। বিয়ের বছর ঘুরতেই প্রথম সন্তান শিহাবের জন্ম হলো। বাবা-মা'র আদরের সন্তান, আদরের প্রথম নাতি-অনেক অনেক আদর ভালোবাসায় বড়ো হচ্ছিল। ওর দু'বছরের ছোটো মেয়ে কান্তা। তাদের ভালো স্কুলে ভালোমতো পড়ালেখা করানো, যখন যা চায় তা পূরণ করা অর্থাৎ সুখের কোনো কিছুর কমতি ছিল না। বাবা-মা ও দুটি সন্তান মিলে সুখের সংসার ছিল তাদের । হাসি-খেলাতে দিনগুলো কী সুন্দরভাবেই না পার করছিল। এভাবে বছরের পর বছর পার করে ওরা এখন যার যার মতো চলতে চায়।

হঠাৎ শিহাব বায়না ধরলো সে M.B.A. করতে অস্ট্রেলিয়া যাবে। অস্ট্রেলিয়া যাওয়া তো মুখের কথা নয়। নাসরিন বলল, তোমার বিদেশ যাওয়া হবে না। এখানেই করো এম.বি.এ.।

ব্যাস, আর যায় কোথায়। খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ছেলে, ওর বাবা'র সাথে কথা বলে না। ছেলের এ হাল দেখে ওর বাবা বলল - ঠিক আছে তুমি কাগজপত্র রেডি কর। এদিকে নাসরিন মা হয়ে বুঝতে পারেনি, ছেলে ইউনির্ভাসিটিতে নাটক করার সময় তার এক সহপাঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। পড়ার সময় মেয়েটি ৪/৫ দিন বাসায় এসেছিল। তখন নাসরিনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মা হয়ে বুঝতে পারেনি যে, ছেলে শেষ পর্যন্ত ঐ মেয়েটিকেই জীবনসঙ্গী করবে। তো যে কথা সেই কাজ। ঘটা করে বিয়ে নয়, একেবারে কোর্ট ম্যারেজ। মানসম্মানের ভয়ে এ বিয়ে পিতামাতা দুজনকেই মেনে নিতে হলো।

তারপর শিহাব বউকে নিয়ে দুজনে একসাথে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কাগজ পত্র প্রস্তুত করতে লাগলো। নাসরিন ছেলের টাকাপয়সা দিলো আর বউ-তার বাবা'র বাড়ি থেকে টাকাপয়সা রেডি করে কয়েক মাসের মধ্যে ওরা চলে গেল। এ যেন কেমন এক স্বার্থপরের মতো পূর্ব-পরিকল্পনা। যাক, ছেলের সুখের কথা চিন্তা করে সব ভুলে গেলো সে। এবং কীভাবে নিজেরা সামনের দিকে এগোবে সে চিন্তা করতে লাগল।

কান্তার আব্বুতো বলেই ফেলল-নাসরিন তোমার ছেলে তো বেশ স্বার্থপর টাইপের। একটু মন খারাপও করল না আমাদের কারও জন্য। উত্তরে নাসরিন আর কী বলবে, চুপ করে থাকল। সে তো অনেক আগেই ছেলের ভাব সব বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কী করবে? মায়ের কাছে সন্তানের সব দোষ স্নেহের পরশে ঢেকে যায়।

যাক, এবার মেয়ের চিন্তায় পড়ল। মেয়েও তো বিয়ের যোগ্য হয়েছে। সুতরাং ঘটককে বলা মাত্র পাত্রের প্রস্তাব আশা শুরু হলো। এর মধ্যেই মেয়ে এম.বি.এ. পাস করে একটা ব্যাংকে ঢুকল।

কেমন যেন চক্ষের পলকে দিনগুলো যেতে লাগল। সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আগে চোখেই পড়তো না। আর এখন এগুলো মনের ভেতর সূচের খোঁচার মতো বিঁধে যায়।

বিদেশে গিয়ে শিহাব খুব কমই ফোন করে। কিন্তু মায়ের মন তো। ছেলে ফোন না করলে কী হবে, মা ফোন করে খোঁজখবর নেয়। তবে তার মনে হয়েছে বউটা খুব একটা সুবিধার নয়। ফোন করলে আন্তরিকতার চেয়ে বিরক্তই বেশি হয়। তার কেন যেন মনে হয়েছে ছেলেটা হাতছাড়া হয়ে গেল বুঝি। এবার মেয়েটাকে বুকের ভেতর আগলে রাখবে। কিন্তু মেয়েতো তার নর্থ-সাউথে পড়া। সে কি বাবা-মা'কে তার বুকের ভেতরে জায়গা দিতে পারবে? ব্যাংকে কয়েক মাস কাজ করার পর মেয়ে এক সিনিয়র অফিসারকে পছন্দ করে বসল। আর যায় কোথায়। তার সাথেই বিয়ে দিয়ে দিতে হলো। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি বনানী চলে গেল। হঠাৎ ঐ দিন সকালবেলা কান্তার আব্বা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কান্তাকে ফোন করে আর দেরি করেনি তাড়াতাড়ি একটা হাসপাতালে ভর্তি করল। কিন্তু নিয়তি খুবই খারাপ-ঐ অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। মেয়ে অনেক কাঁদাকাটি করল। ছেলেও ফোনে কাঁদাকাটি করল। নাসরিন ছেলেকে আসতে বলে। কিন্তু সে কাজের অছিলা দিয়ে না করল। নাসরিনের সবকিছু ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেল। যাক, এবার তার নিজের যাত্রা শুরু হলো। একা থাকাটা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। চোখের জলে জীবনটা যেনো স্থবির হয়ে যেতে শুরু করল। এর মধ্যে ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হয়ে গেল। কারণ ফ্ল্যাট ব্যাংকে মর্টগেজ রেখে ছেলের বিদেশ যাওয়ার টাকা ও মেয়ের বিয়ের টাকা নেয়া হয়েছিল। সময়মতো টাকা পরিশোধ না করাতে এ বাড়িটাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

মেয়ের এখন সময় নাই মা'কে দেখার। মেয়ে মা'কে তার বাসাতে নিয়ে গেল ঠিকই কিন্তু কেমন যেন একটা খাপছাড়া ভাব। মেয়ে ও জামাই সকালে বের হয় আর আসে রাতে। সারাদিন একা একা সময় কাটাতে তার জীবন শেষ হওয়ার দশা। মায়ের এ অস্বস্তি ভাব মেয়ে লক্ষ করে বলেই ফেলল-মা, এভাবে কেমনে থাকবা? আর ওতো তোমার এখানে থাকাটা পছন্দ করছে না। তোমাকে বরং বৃদ্ধনিবাসে রেখে আসি, ওখানে সবার সাথে থাকবা। মা, মেয়ের কথাতে হতবাক হয়ে গেল। ঐ দিনকার এতটুকু মেয়ে-আর আজ বলে কী ? কি শিক্ষা সে দিয়েছে ছেলেমেয়েকে। মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, কর্তব্যপরায়ণতা কিছুই শিখেনি। আর যাদের মধ্যে এগুলো নেই তারা সত্যিকারের মানুষ নয়। যাক, ওরাই তাকে বৃদ্ধনিবাসে নিয়ে এসেছে। প্রথমেই সে ফোনে ছেলেমেয়ের নম্বর রিসিভ করা বন্ধ করল। না....কাঁদলে চলবে না। তাকে একাই বাঁচতে হবে। আবার নতুন করে। যতদিন বেঁচে থাকবে এই বৃদ্ধনিবাসের সবাইকে আপন করে নিতে হবে। এইতো গতকাল তার পাশের বেডে যে মহিলা আসল-তার সাথে পরিচয় হলো। সে তো তার ঘটনা বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল। তার এক ছেলে। বউয়ের অত্যাচারে ছেলে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

এ পৃথিবীর মানুষগুলো বড়োই নিষ্ঠুর। নিজের স্বার্থটাকে বড়ো করে দেখে। বাবা-মা কত কষ্ট করে সন্তানকে মানুষ করে। আর এই সন্তান বড়ো হয়ে বাবা-মা'কে বোঝা মনে করে। তাই আমাদের সন্তানকে মানবিকতা, দায়িত্ববোধ, ধৈর্য এবং কর্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা দিতে হবে। তবেই একটি সুন্দর পরিবার তথা একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। আর বাবা-মা'কে বৃদ্ধনিবাসে যেতে হবে না। একটু স্নেহ, একটু মমতা, একটু ভালোবাসায় বাবা-মা অসীম আনন্দে সন্তানদের সাথে বসবাস করতে পারবে।

লেখক: গল্পকার ও সাহিত্যিক

এপিটাফ

মনজুরুর রহমান

হারানো ছেঁড়া শেকড় খুঁজে পেতে–
বারবার ফিরে আসি তোমার কোলে–
হোসেন্দি হে প্রিয় পিতৃভূমি।
কবে কোন প্রবারণা পূর্ণিমার রাতে
জনকের হাত ধরে–
মির্জাপুর ঘাট ছেড়ে গয়না নৌকায় ইশা খাঁর
তোটক নগর আর ত্রিমোহনীর বাঁক পেরিয়ে,
দুলতে দুলতে স্বপ্ন জাগরণে–
প্রহর প্রত্যুষে পৌঁছে গেছি–কাওরাইদ!
হিম বাতাসে তখন পাখির কুজন আর মুয়াজ্জিনের আজান।
হঠাৎ বাজিয়ে নীল হুইসেল–
যন্ত্রদানবের মতো ধূসর ট্রেন স্টেশন কাঁপিয়ে
আমাকে ধারণ করে গহ্বরে।
সত্যজিৎ'র অপুর মতো
আমিও মুগ্ধ তখন–শিহরিত!
সেই থেকে যাত্রা শুরু গন্তব্যবিহীন
যেন ভাসমান সমুদ্র-সফেন!
অতঃপর ভূমিহীন চাষির মতন কেবলই
করেছি চাষ স্বপ্নের মননে-মেধায়
ঘাট আর হাট ছুয়ে ঘুরেছি অনেক গ্রাম আর শহরে,
তবু অতৃপ্তির ঝুলি পূর্ণ দেখি দিনান্ত বেলায়।
সবুজ চাদরে মোড়া সাত পুরুষের জন্মভিটি
গভীর আবেগে ডাকে আমাকে কেবল।
সেই ডাকে বৃত্ত ভাঙি-অন্তিম ঠিকানা খুঁজে ফেরে এসে স্থিত হই,
নাড়ির নোঙর পোঁতা পবিত্র মাটিতে–প্রগাঢ় প্রত্যয়ে।

তোমার চোখে স্বদেশের হাসি

সোহরাব পাশা

কুহকের ডানা ভেঙে তোমার উত্থান
ফেরাতে পারেনি অগ্নিচক্ষু ঝড়ো হাওয়া
দুঃস্বপ্নের কালো রাত
কেবল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তুমি নও
মহাকালের নায়ক তুমি বঙ্গবন্ধু
মৃত্যুকে করনি ভয় বাংলাদেশকে ভালোবেসে
তুমি ভালোবেসেছিলে বাংলার মানুষ
শস্য-শ্যামল প্রান্তর
তুমি ভালোবেসেছিলে মাথা নিচু করা দুঃখির চোখের জল
আকাশে তখন শঙ্খচিলের সুতীক্ষ্ণ চোখ
উন্মাদ পৃথিবী খোঁজে সোনার মোহর
ভোলেনি তোমার মন বিলাসের মধুর গুঞ্জনে
তুমি চেয়েছিলে শুধু বিহঙ্গের সোনালি আকাশ
সোনাঝরা মুগ্ধ এই স্বদেশের হাসি
তাই তুমি এ দেশ, অভিন্ন ভালোবাসাবাসি।

একান্ত কাছে

ফয়সাল শাহ

স্বপ্নের মায়াজালে বন্দি জীবন
অপেক্ষার হাত ধরে অজানা ভুবন
দিন–রাত সারাক্ষণ একাকি সময়
উজান-ভাটির টানে উদাসী প্রণয়
পুবালি হাওয়ায় ভেসে যায় স্বপ্ন ডানা
একান্ত কাছে সবকিছু অজানা
ব্রহ্মচারী জীবন চলে যায় স্বপ্নমায়ায়
দিবস-রজনী হারিয়েছি তোমার ছায়ায়
মন আমার বিবাগী আজি
অজানা যাত্রায় তোমায় শুধু খুঁজি
পাবকী পাব তোমায় মনে শুধু ভয়
সবকিছু মেনে নেব জীবনে যা কিছু হয়।

আকাশ জুড়ে সাদা কালো মেঘ

দেলওয়ার বিন রশিদ

আকাশটা বড়ো বেশি নীল
নীলাভ আকাশে সাদা–কালো মেঘ
মেঘগুলো কখনো তুলো হয়ে
নীল সমুদ্রে ভাসে
এলোমেলো মেঘের বলাকারা
বিশাল বিস্তৃত আকাশে
মেঘের এ খেলা বিরামহীন
জীবনের আঙিনায় কত মেঘ
এলোমেলো হয়ে থাকে
কখনো কাঁদায়, অশ্রু ঝরায়
কাজে কিংবা অবসরে
জীবনের আঙিনায় ছড়ানো মেঘগুলো ঢেউ তোলে
নিঃশব্দে খেলা করে
মেঘের রং কখনো সাদা কখনো কালো
সুখ–দুঃখ যেন পাশাপাশি বয়ে চলে।

বঙ্গবন্ধু

আ.শ.ম. বাবর আলী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যে দেখেনি–
সে কোনো
বাঙালিকে দেখেনি।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের
সাতই মার্চের ভাষণ যে শোনেনি–
একটি অত্যুচ্চ হিমালয়ের
বলদীপ্ত বজ্রনিনাদ
সে শোনেনি।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের
ইতিহাস যে জানে না–
স্বদেশ-স্বজাতি বিশ্ব আর
আত্ম ইতিহাস তার কাছে
চির অজানা।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যারা
অস্বীকার করে,
আপন প্রজন্ম পরিচিতি
অস্বীকৃত তার কাছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যারা ভালোবাসে,
এদেশের পানি-বায়ু-মাটি-বাতাস
সবার ভালোবাসা
একমাত্র তাঁরই জন্য।

স্বপ্নযাত্রা

চন্দনকৃষ্ণ পাল

দিগন্তহীন আকাশে পাখা মেলে উড়ি
মহাশূন্য গিলে ফেলে এক লহমায়
তারপর হজম ক্রিয়া হতে হতে উড়ে চলা-
এমন অদ্ভুত কাণ্ডে জড়িয়ে রয়েছি।
দীপান্বিতা এলে
নিকষ অন্ধকারে
প্রদীপ হবার ইচ্ছে দানা বেঁধে ওঠে।
আরো কত ইচ্ছে আজ
প্রদীপের সলতে হয়ে যায়
নিটোল আলোতে পুড়ে,
পুড়ে পুড়ে অন্ধকার গাঢ় করে আরো।
অনুক্ষণ স্বপ্নে থাকি মানুষ-দেবতা।

কোথাও যাবো না

দেলোয়ার হোসেন

আমি কোথাও যাবো না
ছায়া ছায়া মায়া মাখা এই গ্রাম ছেড়ে।
সারাদিন বাড়ির পাশে বাবুই পাখিরা
ঝাঁকবেঁধে ঢেউয়ের মতো উড়ে
আহা কী আনন্দে–সারা মাঠ জুড়ে ঘুরে ঘুরে।
ছোটো ছোটো ঢেউ নাচে হানু নদীর বুকে,
ঘড়িয়াল পাখিরা পাকা ফল খায়
কালীবাড়ির বটগাছে,
এ ডাল সে ডাল ঘুরে গুম গুম স্বরে।
পথের দুপাশে গাছে গাছে
ফোটে শিমুল–পলাশ–ডাকে কোকিল
আমি কোথাও যাবো না এই গ্রাম ছেড়ে।
চৈত্রে সন্ন্যাসী–পূজা–ড্যাম কুর কুর ঢোল বাজে
বহুদূর থেকে আসে ভক্তেরা দলে দলে
শেষ বেলা বটতলায় জমে ওঠে মেলা।
মাঠের মাঝখানে 'কানা বিল'
বকেরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে-খোঁজে
টেংরা পুটি কাদাজলে।
দুপুরে উড়ে উড়ে কাঁদে সোনা চিল।
সন্ধ্যায় শুনি আজানের ধ্বনি আল্লাহু আকবার,
পুজারি বাজায় কাসার ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং মন্দিরে।
আমি কোথাও যাবো না
ছায়া ছায়া মায়া মাখা এই গ্রাম ছেড়ে।
বেহারা পাড়ার গলিপথে কখনো
সে আসে স্নানে পীরের পুকুরে,
পরণে শিপন শাড়ি কচি কলাপাতা রং–
বর্ষার প্রখর বৃষ্টিতে ফোটা
কদমফুলের মতো মুখ তার স্নিগ্ধ কোমল।
আমি কোথাও যাবো না
পাখি, নদী, বিল, চিল আর
স্মৃতিময় আমার এই শৈশব ছেড়ে।

নতুন পিরামিড

রেজাউদ্দিন স্টালিন

ফিলিস্তিনের আকাশে চাঁদ ওঠে
হেলমেট মাথায়
বর্ম বুকে ওঠে সূর্য
তারারা নিঃশব্দে কাঁপে ভয়ার্ত শিশির ধোঁয়া
ভারানত মেঘ চরে বেড়ায়
উঠোনে উঠোনে
রক্তের নদী মরে পড়ে থাকে বিছানায়
মাথার উপর কাকেরা চ্যাঁচায়
চিলের চিৎকারে ছিঁড়ে যায় দিগন্ত
বোমারু ঈগল আগুনের ডিম দেয় শূন্যে
কোথাও কোনো আর্তনাদ নেই
ধ্বংস আর হত্যা স্বাভাবিক করে দিয়েছে নিয়ম
বরফ আর আগুনের স্বাদ শিশুদের জিহ্বায় এক
জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে শুধু স্মৃতিস্তম্ভ
মানুষের মাথার খুলির পিরামিড
সম্পূর্ণ নতুন
তাকে এখনো পাহারা দেয় স্ফিংস।

শ্রাবণের সন্ধ্যা নেমে এলে

সাঈদ তপু

শ্রাবণের সন্ধ্যা নেমে এলে
বিরহী বর্ষা থামে পাতার ফাঁকে
প্রকৃতির বাঁকে বাঁকে সাজানো
ঋতুর বর্ণমালা
নবীন ঋতুময়তায়
ছেঁড়া রোদে হেসে ওঠে
শরতের ঠোঁট
দলবেঁধে বলাকারা
মুক্তির বারতা ছড়ায়
আকাশের কোলে
মাঠে, ঘাটে, অরণ্যে
সবুজ তৃণের বুক
উচ্ছ্বাসে দোলে।
বাউল মেঘের দল
জোট ভেঙে ভেসে যায়
খেয়ালের খেয়ায়
অতঃপর নদীতট
কাশফুলের ঘুঙুর পরে পায়
ধেয়ে যায় সমীরে
কী অদ্ভুত ! নির্ঝর নৈশব্দে
জেগে ওঠে পাড়া, গাঁ
ডাহুকের বন
জেগে ওঠে আদিম প্রহরের
জমে থাকা হিমাচল
জেগে ওঠে প্রকৃতির
বিদীর্ণ মন।

স্বাধীনতার কাব্য

স্বপন মোহাম্মদ কামাল

একাত্তরের বন্য ঘোড়া ছুটেছিল তেপান্তরে
মুক্তিকামী বঙ্গসেনা বীরের মতো লড়াই করে,
দুষ্ট ছেলে, দামাল ছেলে পাক-বাহিনী হটিয়ে দিল
একাত্তরে ডিসেম্বরে জাতির বিজয় ছিনিয়ে নিল।

একাত্তরে রণাঙ্গনে পরাজিত ঘাতক সেনা
অনেক চড়া মূল্য দিয়ে স্বদেশ-স্বাধীনতা কেনা,
একাত্তরে জীবন দিল তিরিশ লক্ষ বীর জনতা
দেশের মানুষ ফিরে পেল জাতি-সত্তার সব ক্ষমতা।

মহান নেতা বঙ্গপিতা ঘোষণা দেন স্বাধীনতার–
যার যা আছে, লড়াই কর– বিজয় হবে বীর জনতার,
আহবানে এক হয়ে সব ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক-শিবিরে
কেউ বা হলেন শহিদ, কেউবা গাজীর বেশে আসলো ফিরে।

তিরিশ লক্ষ শহিদানের দেশটাকে আজ গড়তে হবে
শিল্পকলা সাহিত্য আর সংস্কৃতির সে বৈভবে,
গরিব-ধনীর প্রভেদ মুছে এগিয়ে গিয়ে সমান তালে–
তবেই হবে এ বিজয়ের স্বার্থকতা–সর্বকালে।

আমরা আছি তোমার হৃদয়ে

মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ

একটি প্রিয় মুখ
যা দেখবার জন্য এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
সমবেত হয়েছি লক্ষ লক্ষ মাতৃভক্ত জনতা
সমবেত হয়েছি সেই সব মাতৃভক্ত জনতার লক্ষ লক্ষ ব্যাকুল চোখ।
সেই চোখগুলো বলতে চাইছে, জয় তোমারই হোক!
মাতা, জয় তোমারই হোক!
একটি প্রিয় কথা
যা শুনবার জন্য এই আকাশলীনা সামিয়ানার নিচে
সমবেত হয়েছি লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত ব্যাকুল কর্ণকুহর।
সেই কানগুলো শুনতে চাইছে মায়ের সুভাশীষ বচন
'ও পথে যেয়ো না খোকা! ফিরে এসো আমার বুকে
এখানেই স্বর্গ তোমার, চিরকাল-ই থাকবে সুখে।'
একটু স্নেহাশীষ
যা পাবার জন্য এই সবুজে সবুজময় দূর্বাঘাসের বুক থেকে
ঝরছে ধূসর ধূলিরাশি ;
স্বপ্নবোনা মানুষগুলোর মুখে আজ স্বাধীনতার অট্টহাসি ;
বিছিয়ে দাও তোমার স্নেহ আঁচল মাতা;
আমরা আজ চিৎকার দিয়ে বলি 'মাগো! তোমায় ভালোবাসি।'
হে রত্নবতী!
হে সুশোভিত স্নিগ্ধ জননী!
তুমি এসে তৃপ্ত কর আমাদের লাখো লাখো মানুষের চোখ
হে সুজলা-সুফলা বঙ্গ জননী!
তুমি এসে তৃপ্ত কর লাখো লাখো মানুষের কর্ণকুহর
হে শস্য-শ্যামলা মুগ্ধ জননী!
তুমি এসে গ্রহণ কর লাখো লাখো মানুষের হৃদয়ের
একটি ব্যাকুল প্রার্থনা 'তুমি দীর্ঘজীবী হও মাতা!'
তোমার হৃদয়ে আমরা আছি ষোলো কোটি নিরীহ জনতা!
তোমার হৃদয়ে আমরা আছি ষোলো কোটি নিরীহ জনতা!!
তোমার হৃদয়ে আমরা আছি ষোলো কোটি নিরীহ জনতা!!!

রাতান্ধ পাখি তুমি

শম্পা প্রদীপ্তি

ভুলগুলো ফুল হয়ে যাক,
হৃদয়ের সন্ধ্যা তোমার সাজুক জোনাকি-আলোয়;
রাতান্ধ পাখি তুমি,
নক্ষত্রের শুভ্র দীয়ার অপরূপ শোভা তুমি দেখবে কি করে?
কখনো দিনেও তুমি অযথাই হয়ে যাও অন্ধ মার্জার;
চিকা ভেবে দৌড়াও মধুশিস মুনিয়ার পিছে।
ভুলগুলো ফুল হয়ে যাক;
কত আর ফুলকে তুমি ভুল করে ভাববে আগুন!
কত আর ফুল ভেবে হাত দেবে প্রদীপ শিখায়!
সুখের সকালগুলো ভরে দাও দুঃখের প্রদোষে তুমি
রুপোলি বিকেলগুলো বৃথায় হারায়;
ভুলগুলো ফুল হয়ে যাক,
হৃদয়ের আঁধার তোমার দূর হোক দিবস-বিভায়।
বিহগের শিস শুনে অযথাই চমকে ওঠো আশুশিস ভেবে;
ভুলগুলো ফুল হয়ে যাক,
শুদ্ধতার অগ্নিস্নানে ঘুচে যাক অন্ধত্ব তোমার।

শরতের শার্টের পকেটে ছিল রোদেলা দুপুর

মানজুর মুহাম্মদ

আমরা এক ঠোঁটে পড়ে গেছি
বহুদূর জীবনানন্দ, তলস্তয়, ইলিয়ট.....
পেছন ফেরে কাউকে পাইনি
মালতি বা শিউলির মালা গেঁথে রাবিন্দ্রিক বন্দনায়।
পিচঢালা পথে শুয়ে ছিল শুধু সাদা মেঘ,
সতী অ্যাপ্রনের ঘ্রাণ।
কাশফুলের শেষ গোপনে
শরত চায়নি ফেরৎ আমার রুপোর নূপুর
তারপর আমি একাই ফিরে ছিলাম গোধূলির কাছে
শরতের শার্টের পকেটে তখনো ছিল আমার রোদেলা দুপুর।

আমি আজ বর্ষায় মজেছি

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

রুক্ষ শুষ্ক গ্রীষ্ম থেকে মুক্ত হয়ে সিক্ত হতে
আমি আজ বর্ষায় মজেছি।
টুকরো টুকরো মেঘের মালাকে আমি আজ
দুহাতে আকাশ থেকে
বৃষ্টি বানিয়ে বানিয়ে লুটিয়ে দেবো।
আমি আজ ভিজব, ভিজাব সবাইকে।
মরুভূমি সমভূমি হবে আজ!
স্রোতহীন নদী হবে স্রোতস্বিনী ও যৌবনবতী।
আমি আজ অনাবাদী জমি আবাদের
উপযোগী করে তুলবই
পত্রহীন বৃক্ষকে করব পত্র-শোভিত
পুষ্পহীন বৃক্ষে ফোটাবো রঙিন ফুল
ফলহীন বৃক্ষকে করব ফলবান
আমি আজ শুনব পাখির কণ্ঠে গান।

প্রয়োজন নেই অমন ভালোবাসার

সামসুন্নাহার ফারুক

ভালোবাসি শব্দটির উচ্চারণে
অমন দ্বিধা কেন?
সাহস নেই বুঝি?
ফিরিয়ে দেব কি দেব না
আইবলের এক্সপ্রেশন দেখেও বোঝ না?
এতটাই দুর্বোধ্য নাকি?
উদাসী উদাসী ভাবটা ছেড়ে একবার
বাস্তবে নেমেই দেখ
কোন্ টক্সিনে আক্রান্ত আর্টারির
হীরন্ময় অধ্যায়?
কোন রসের উদ্দীপনে হৃদপিণ্ড এমন
কৃষ্ণাগ্নি দহন?
না বুঝলে শোনো
অমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভালোবাসার
দরকার নেই আমার
চৌচির বুকে একলা থাকাটাই
ঢের ভালো।

বাংলার বর্ষা

কামরুল ইসলাম সাঈদ

আষাঢ়ের পথ ধরে বাংলায় বর্ষা হয়েছে শুরু,
শ্রাবণের অবিরল ধারায় মেঘ ডাকছে গুড়ু গুড়ু।
নিথর প্রকৃতির বুকে চলছে ঝমঝম বৃষ্টির খেলা,
নীলাম্বরে ছেয়ে গেছে শত পাংশু মেঘের ভেলা।
হৃদয়ের গভীরে বর্ষা আন্দোলিত করে মন,
নিঃশব্দে জানালার পাশে নিশ্চুপে বসেছি সারাক্ষণ।
তৃষ্ণাদীর্ণ বাংলার বুকে আজ নেই অস্থির হাহাকার,
নতুন প্রাণের শিহরণে মেতেছে মেঘ মেদুর অম্বর।
ধূলিধূসর বঙ্গ প্রকৃতিতে আজ নেই মালিন্য রুক্ষতা,
নব জলধারার অবগাহনে মনে জেগেছে ব্যাকুলতা।
সবুজ শ্যামল সমারোহে আজ হয়েছে সবে অন্ধ,
কদম- কেয়া-জুঁই-কামিনীর মাতাল সমীরণ গন্ধ।
সজল গগণে বলাকার সারি ফেরে আপন নীড়ে,
ডাহুক ডাকে দূরে কোথাও তমাল কুঞ্জ তিমিরে।
বিরহেতে মন পুড়ে যায় তাহার কথা ভেবে,
চিরমিলনের আশ্বাসে মোর আসবে পাশে কবে?
উদাস মন মোর চাই হারাতে স্বপ্নের জগতে,
সব কথায় কি মূর্ত হয়ে ফোটে কবিতাতে?
রঙের মেলায় খেলা জমে, মন গুনগুনিয়ে ওঠে,
বর্ষা যেন হৃদয় বাঁধন কভু নাহি টুটে।

ছবির সনেট

রীনা তালুকদার

ভোজ্য তেলের কলের গরু আর ঘানি
সুদৃশ্যের সারি বাঁধা নারকেল বিথি
এ বাংলার সুপ্রাচীন শোভাময় প্রীতি
দৌড়ে গরুদের ঘাড়ে চড়ে ভারী ঘানি
বা হাতে ধরা ঘানির ঢেঁকি অন্য হাতে
জোয়ালের জোড়া টানা সামলাতে
চলে কঠিন চাপের পাটাতনটাতে
ঐতিহ্যের সেই দিন শুধুই স্মৃতির
পরিশ্রমে ঘামে লেখা মধুর প্রীতির
কলু'দের দিন আজ বেদনাবিধুর
যশোরে কেশবপুর -এ ভালুকাঘর
মেহেরপুর, বেগম পুর, বাদুড়িয়া,
সাগরদাঁড়ি, বায়সা ও সাতবাড়িয়া,
গোপালপুর পাঁচ'র গাছ'র নগর।

বঙ্গবন্ধু

ওয়াসীম হক

আমরা স্বাধীন যায় না লেখা
তোমার নামটি ছাড়া
সাক্ষী আছে রুপোলি চাঁদ
সাক্ষী হাজার তারা
সাগর নদী পাখপাখালি
উজান স্রোতের নাও
সবুজ বনে শ্যামল টিয়ের
ডাক শুনতে পাও
বাংলার জলে মাটি আর ঘাসে
তোমার রক্ত বহমান
বেঁচে আছ তুমি সবার হৃদয়ে
শেখ মুজিবুর রহমান।

অক্টোপাস

রুস্তম আলী

আমি কি বেরিয়ে যেতে পারব
আমার আমি থেকে।
আমি কি কাঁদাতে পারব এ ধরা
আমার জীবন প্রদীপ নিভে গেলে।
আমার দু'আঁখি কি আলো জ্বেলে যাবে
আমার মরণের পরে।
আমার কথা কি সবার কথা হবে
আমি চলে গেলে ওপারে।
আমি যখন চলে যাব না ফেরার দেশে
কর্ম কি আমাকে অমর করে রাখবে অবশেষে।
এ সবই ডাহা মিথ্যা কল্পনা।
চির সত্য হলো–অক্টোপাসের মতো
আমাকে আমি রেখেছি ঘিরে।
শেওলায় ঢাকা গভীর সমুদ্রে।
অনন্তকাল তোমার কাছাকাছি
তুমি যেই বললে হও, অমনি হলাম
ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার ফুঁড়ে ধীরে ধীরে
ভেদ করে টগবগে ফুটন্ত এক আস্তরণ
যেন দুধের সর, লক্ষ বছর পর ঠাণ্ডা হলাম।
তুমি আবার বললে হও, আবার হলাম
চরিদিকে ভরিয়ে দিলাম সবুজ আর সবুজ
কেউ কাউকে চিনি না সবাই হরেকরকম
ছড়িয়ে দিলাম তা আমার বুকের ওপর।
কোটি বছর পর আবার বললে হও, হলাম
তুমি যেভাবে বললে ঠিক সেভাবেই হারলাম
কী ঘটল হঠাৎ তুমি বললে, চলে যাও
আবার এক-অচিনপুরে চলেই এলাম।
ফের বললে থাকো, সেই থেকে আছি
অনন্তকাল ধরে তোমার কাছাকাছি?

বানভাসি

তাহমিনা

ষোলো কোটি মানুষের বাংলাদেশে
প্রকৃতির নিয়ত খেলা ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে
দেশ আজ বিপন্ন চারদিকে হাহাকারে আর হাহাকারে
সব হারানো বানভাসি মানুষগুলোর একফোঁটা ঠাঁই নেই
নেই কোনো আশ্রয়।
ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর। নেই এগুলো নিবারণের উপায়
হায়রে নিরন্ন মানুষ, একে গৃহহারা তার ওপর খাবারের অভাব।
কীভাবে করি একটু আশ্রয় আর খাবারের ব্যবস্থা
আমজনতা থেকে কোটিপতি–একটু সদয় হোন
কত অপচয় তো করেন নিজের খেয়ালের বশে
আজ না হয় একটু দাঁড়ান এসব বানভাসিদের পাশে।
বিন্দু বিন্দু জলকণায় সৃষ্ট হয় সমুদ্রের, এক হতে শ, হাজার
সবাই যদি সামিল হই তাহলে হয়ে যাবে তাদের একটু সহায়
আসুন সবাই দলমত নির্বিশেষে এক কাতারে,
মানবতা যেথায় ডুকরে কাঁদে
তাহলে সবার সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় আবার তারা
দাঁড়াবে ঘুরে।

জাতির পিতার ৪২তম শাহাদত বার্ষিকীতে

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালন

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ইস্যুতে চাহিদা অনুযায়ী প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও টিভি ফিলার নির্মাণ করে এ অধিদপ্তর। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সচিত্র কভারেজ ও ফুটেজ সংরক্ষণ করা ডিএফপি'র অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরে নিয়মিত প্রকাশনা সচিত্র বাংলাদেশ, শিশু-কিশোর মাসিক নবারুণ, বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি বিনির্মাণে ইংরেজি ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকা এ অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, পর্যটন, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বই, পোস্টার, পুস্তিকা, লিফলেট, স্টিকারসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রয়োজন অনুসারে এ অধিদপ্তর মুদ্রণ করে। সারাদেশের পত্রিকাসমূহের নামের ছাড়পত্র প্রদান, প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচার সংখ্যা নির্ধারণ ও ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন মনিটর করে ডিএফপি। তদুপরি প্রিন্টিং প্রেস ও পাবলিকেশনস (নিবন্ধন ও ঘোষণা) আইন-১৯৭৩ অনুসারে প্রেস আপিল বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন, পত্রিকার বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রকাশিত পুস্তকসমূহের গেজেট প্রকাশ এ অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণ, বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান হাতে লেখা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের অডিও-ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণ ও প্রকাশে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। ডিএফপি'র চলচ্চিত্র শাখার কর্মকর্তা মহিবুর রহমান খায়ের, আমজাদ হোসেন, জি. জেড. আবদুল মবিন, এম.এ.রউফ ও এস.এম. তৌহিদ বাবু-এর সাহসী ভূমিকার কারণে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের অডিও-ভিডিও কভারেজ করা, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কেরানীগঞ্জে তা সংরক্ষণ করা ও পরবর্তীতে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। অধিদপ্তরের আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন শাখার তৎকালীন কর্মকর্তা আবদুর রউফ বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান হাতে লেখেন এবং এজন্য 'মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন।

৯ই আগস্ট ২০১৭ ডিএফপিতে তথ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত স্থিরচিত্র প্রদর্শনী দেখছেন তথ্য সচিব মরতুজা আহমদ। সাথে রয়েছেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা কামরুন নাহার, ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনসহ কর্মকর্তাগণ

১৫ই আগস্ট ২০১৭ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শোক র‍্যালিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে প্রথমবার ক্ষমতায় আসলে ডিএফপি'র ফিল্ম শাখায় সংরক্ষিত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের অডিও-ভিডিও ফুটেজ ভারতের মাদ্রাজের প্রসাদ ল্যাব থেকে ডেভেলপ করে ভিডিও ফরম্যাটে স্থানান্তর করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সরবরাহ করা হয়। এসব ফুটেজ ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। অবশিষ্ট ফুটেজগুলো সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে জমা দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ কভারেজের স্মৃতিবাহী নাগ্রা মেশিন ও ক্যামেরাটি ডিএফপিতে এখনো সংরক্ষিত আছে। এই ঐতিহাসিক ভাষণের ভিডিও ফুটেজসহ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের দুর্লভ ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে।

যমুনা নদীর ওপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ, মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে সরকারি অনুদানে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'একজন মুক্তিযোদ্ধা' সর্বপ্রথম টেলিভিশনে প্রিমিয়াম শো'র মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১১ প্রাপ্ত প্রামাণ্যচিত্র লোকনায়ক কাঙাল হরিনাথ ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫ প্রাপ্ত প্রামাণ্যচিত্র একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি নির্মাণ এ অধিদপ্তরের অন্যতম কৃতিত্ব।

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ৯–১৫ আগস্ট ২০১৭ সপ্তাহব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি পালন করে। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল–

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিদিন ডিএফপি'র অফিস ভবনের সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন।
- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হলে প্রতিদিন বিকাল ৪টা–৫টা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন।
- ১৫ই আগস্টের ওপর বিভিন্ন সময় ডিএফপি প্রকাশিত সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলিসহ বিভিন্ন প্রকাশনার প্রদর্শনী ও বিক্রয়।
- তথ্য অধিদফতর-এর সহায়তায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সপ্তাহব্যাপী স্থিরচিত্র প্রদর্শনী।

এছাড়া দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য ডিএফপি অন্যান্য যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে তারমধ্যে রয়েছে –

- ১৫ই আগস্ট উপলক্ষে ১০ লক্ষ পোস্টার মুদ্রণ ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা তথ্য অফিসসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে বিতরণ।
- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ এবং প্রতিটির ১০ হাজার কপি সারাদেশে বিতরণ।
- ডিএফপি নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র অসমাপ্ত মহাকাব্য (বাংলা), চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু (বাংলা ও ইংরেজি), সোনালী দিনগুলো (বাংলা ও ইংরেজি), বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রথম সমাপণী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (বাংলা) প্রভৃতির কপি সারাদেশে মাঠ পর্যায়ে এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে প্রচারের জন্য গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে, বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে প্রচারের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ-এর সদর দপ্তরে এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন ও সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রেরণ।
- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ইংরেজি ভাষায় ৫ হাজার কপি পোস্টার মুদ্রণ করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রচারের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৯ই আগস্ট ২০১৭ ডিএফপিতে 'জাতীয় শোক দিবস'-এর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তথ্য সচিব মরতুজা আহমদ

৯-১৫ই আগস্ট ২০১৭ 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে ডিএফপি আয়োজিত প্রকাশনার প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

৯ই আগস্ট ২০১৭ সপ্তাহব্যাপী ডিএফপি চত্বরে 'ডিজিটাল ডিসপ্লে' শুরুর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানমালার উদ্‌বোধন করেন তথ্য সচিব মরতুজা আহমদ। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন-এর সভাপতিত্বে ডিএফপি'র মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা কামরুন নাহার এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। একই অনুষ্ঠানে শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৭ প্রদান এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫ ও ২০১১ প্রাপ্ত ডিএফপি'র কলাকুশলীদের সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

কর্মকর্তা ক্যাটাগরিতে আবদুল্লাহ আল হারুন এবং কর্মচারী ক্যাটাগরিতে মো. মঈন উদ্দিন অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৭ লাভ করেন। এছাড়া ডিএফপি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র লোকনায়ক কাঙাল হরিনাথ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১১ লাভ করায় এর প্রযোজক মো. আবু তাহেরকে এবং একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি প্রামাণ্যচিত্রটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫ অর্জন করায় এর প্রযোজক আবদুল্লাহ আল হারুন ও চিত্রগ্রাহক মো. শাহ আলমসহ সকল কলাকুশলীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

১৫ই আগস্ট ২০১৭ 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে ডিএফপিতে আয়োজিত দোয়া মাহফিল

ডিএফপি গৃহীত কর্মসূচির শেষ দিন ১৫ই আগস্ট ২০১৭ সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে ডিএফপি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই দিন দুপুরে ডিএফপি প্রাঙ্গণে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা এবং দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতার কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা শেষে ১৫ই আগস্টের শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ দোয়া করা হয়। এ সময় ডিএফপি'র মহাপরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং কলাকুশলী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: নাহিদা সুলতানা, ফটো ফিচার: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন ও ফরিদ হোসেন

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

মন্দ ও দেশীয় সংস্কৃতির পরিপন্থি বিষয় বর্জন করার আহ্বান

২০শে জুলাই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত 'শিল্পকলা পদক ২০১৬' বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, আকাশ সংস্কৃতির যেসব বিষয় দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা গ্রহণ করে মন্দ ও দেশীয় সংস্কৃতির পরিপন্থি বিষয় বর্জন করতে হবে। তিনি সৃজনশীল বাংলাদেশ নির্মাণ এবং দেশের লোকসাহিত্য ও ঐতিহ্য বিকাশে শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৪শে জুলাই বঙ্গভবনে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭' উপলক্ষে পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে দেশের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও লোকগাথা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সংস্কৃতিকর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) যুগে আকাশ সংস্কৃতি এখন বাস্তবতা। কিন্তু জনগণ ও সংস্কৃতিকর্মীদের ভালো জিনিস গ্রহণ এবং যা মন্দ ও দেশের জন্য ক্ষতিকর তা বর্জন করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি পদক বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তরুণ সমাজ আপনাদের অনুকরণ করতে পছন্দ করে। তাই তাদের প্রতি আপনাদেরও দায়বদ্ধতা রয়েছে।

মৎস্য খাতের ক্ষতি প্রতিরোধে কঠোর নজরদারির আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, বিভিন্ন প্রজাতির মিঠাপানির মাছ চাষ ও সংরক্ষণ এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই মৎস্য খাতের কোনো ধরনের ক্ষতি প্রতিরোধে কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২৪শে জুলাই 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭' পালন উপলক্ষে বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, তিনিই ১৯৭৩ সালে গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করা শুরু করেছিলেন। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

ওয়াটার সামিট ২০১৭-এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে জুলাই হোটেল সোনারগাঁও-এ তিন দিনব্যাপী 'ওয়াটার সামিট ২০১৭'- এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এসডিজি'র নির্ধারিত সময়সীমা ২০৩০ সালের আগেই শতভাগ মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার এবং ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যেই সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করেন। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে পানি ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে পৃথক ফান্ড গঠনের দাবি জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন ছিল– 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'। সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের তাগিদ

২৯শে জুলাই হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'ঢাকা পানি সম্মেলন ২০১৭'-এ বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মন্ত্রী ও ডেলিগেটদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

থেকে নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব পরিস্থিতির দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে।' সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ডেল্টা কোয়ালিশন মিনিস্ট্রিরিয়াল কনফারেন্সে 'ঢাকা ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলেন। বর্তমানে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই সম্মেলনে অংশ নেন বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, মিশর, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মোজাম্বিক, মিয়ানমার, কোরিয়া, নেদারল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনামসহ ২৩ দেশের মন্ত্রী এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা।

জলাবদ্ধতা নিরসনে বক্স-কালভার্ট খুলে দেওয়ার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে জুলাই সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর জলাবদ্ধতা দূর করতে যে খালগুলোর ওপরে বক্স-কালভার্ট রয়েছে তা খুলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সেসঙ্গে নদী খননের জন্য ভারী ড্রেজিং মেশিন ব্যবহারের বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে বলে পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বক্স-কালভার্টের ওপরের রাস্তায় খালের দুই পাড়ে পিলার দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা সংরক্ষণের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা আগস্ট তাঁর কার্যালয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর ও রাজউক-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে কোনো স্থাপনা ভেঙে নতুন করে নির্মাণ, সংরক্ষণ বা সংস্কারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় করার অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই আগস্ট তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির চতুর্থ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় তিনি 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়'-এর নাম পরিবর্তন করে 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়' করার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এছাড়া বৈঠকে 'জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৭'-এর খসড়া এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য 'জাতীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার' খসড়াও অনুমোদন পায়। মংলা বন্দর এলাকায় পরিবেশবান্ধব নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান করার অনুমোদন দেওয়ারও নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। চাষের জমি রক্ষা করার পাশাপাশি অহেতুক গাছ না কাটা এবং নতুন আবাসন এলাকা ও শিল্পাঞ্চলে জলাধার রাখার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী এবং সুন্দরবনকে সৃষ্টিকর্তার উপহার হিসেবে উল্লেখ করে নতুন বনায়নের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

জনগণের পুষ্টি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই আগস্ট তাঁর কার্যালয়ে জাতীয় পুষ্টি পরিষদের (এনসিসি) প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুষ্টি নিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি জনগণের পুষ্টি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি এবং তাঁর সরকার দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে বলে উল্লেখ করেন।

নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে আগস্ট দিনাজপুর যান এবং দিনাজপুর জিলা স্কুল মাঠে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বন্যায় যাদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ঘরবাড়ি মেরামত করে দেওয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন, বানভাসি কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না এবং না খেয়ে মারা যাবে না। এছাড়া নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

টিভি পেশাজীবী ও ডিজিটাল নিরাপত্তা রক্ষায় ত্রিপক্ষীয় যোগাযোগের ভিত্তিতে কাজের সিদ্ধান্ত

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১লা আগস্ট সচিবালয়ে সংবাদপত্র মালিক সমিতি নোয়াব ও এটকো'র বৈঠকে বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা রক্ষায় এটকো, নোয়াব ও সরকার ত্রিপক্ষীয় যোগাযোগের ভিত্তিতে কাজ করবে। সেই সাথে টিভি পেশাজীবীদের সংগঠন ফেডারেশন অব টেলিভিশন প্রফেশনালস অর্গানাইজেশন–(এফটিপিও) উত্থাপিত টিভি বিষয়ক প্রস্তাবনা পর্যালোচনাতেও একযোগে কাজ করবে এটকো, এফটিপিও এবং তথ্য মন্ত্রণালয়।

বঙ্গবন্ধুর রক্তঋণ শোধ ও দেশকে এগিয়ে নিতে সকল চক্রান্ত উচ্ছেদ করতে হবে

তথ্যমন্ত্রী ২রা আগস্ট রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে 'দেশ ও গণতন্ত্র বিরোধী ষড়যন্ত্র–চক্রান্তের রাজনীতির বিরুদ্ধে জাসদের গণমিছিল' উদ্‌বোধনকালে বলেন, বঙ্গবন্ধুর রক্তঋণ পরিশোধ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে সকল ষড়যন্ত্র–চক্রান্তের রাজনীতি সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। এটাই শোক ও প্রতিশোধের মাস আগস্টের শপথ।

তিনি বলেন, 'আগস্ট মাস জাতির জন্য সবচেয়ে কঠিন শোকের

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সঙ্গে ১লা আগস্ট ২০১৭ তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেসরকারি টেলিভিশন স্বত্বাধিকারী অ্যাসোসিয়েশন (এটকো)-এর নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি

মাস ও জাতির ওপর সবচেয়ে বড়ো ষড়যন্ত্র–চক্রান্তমূলক আঘাতের মাস। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই বার বার আগস্টে আঘাত হেনেছে দেশ ও জাতির ওপর। আগস্টেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল, সংবিধানকে পদদলিত করা হয়েছিল, সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য গ্রেনেড হামলা হয়েছিল।' **প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন**

একনেকে আট প্রকল্পের অনুমোদন

১লা আগস্ট : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে ৩ হাজার ১৭১ কোটি টাকা ব্যয়ের আটটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। এ বছর সপ্তাহটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'মাতৃদুগ্ধ পান টেকসই করতে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই'। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের উদ্‌বোধন করেন।

ভিটামিন 'এ'-প্লাস খাওয়ানো হয় সোয়া ২ কোটি শিশুকে

৫ই আগস্ট : জাতীয় ভিটামিন 'এ'-প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় সারাদেশে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সি ২ কোটি ২৫ লাখ শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ঢাকা শিশু হাসপাতাল মিলনায়তনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্যাম্পেইনের উদ্‌বোধন করেন। ৬ থেকে ১১ মাস বয়সি শিশুদের একটি করে নীল রঙের ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের একটি করে লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস পালিত

৬ই আগস্ট : বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনে পালন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '৭৬ তম প্রয়াণ দিবস'।

বন্ধু দিবস

❑ নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় 'বন্ধু দিবস'।

বিশ্বের আরো সাত শহরে নতুন মিশন হচ্ছে

৭ই আগস্ট : অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও কানাডার টরেন্টোসহ বিশ্বের সাত শহরে বাংলাদেশের আরো সাতটি নতুন মিশন স্থাপন হচ্ছে। এছাড়া স্থাপিত ১৭টি মিশনকে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এছাড়া মন্ত্রিসভায় নজরুল ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৮ই আগস্ট : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শেখ ফজিলাতুন নেছার মতো একজন নারীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন বলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সংগ্রামী জীবনে সাফল্য পেয়েছেন বলে মনে করেন তাদের মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

একনেক বৈঠক

৯ই আগস্ট : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনসহ ১১ প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

জ্বালানি নিরাপত্তা বৈঠক

❑ জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করতে পালিত হয় 'জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস'। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্বালানির অপচয় রোধে এর যথাযথ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া জ্বালানি বিভাগ র‍্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস

১২ই আগস্ট : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক যুব দিবসটি' পালিত হয়।

শুভ জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপিত

১৪ই আগস্ট : উৎসব ও আনন্দমুখর পরিবেশে সারাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি 'শুভ জন্মাষ্টমী' উদ্‌যাপিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই আগস্ট ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই আগস্ট ২০১৭ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে 'জাতীয় শোক দিবস'-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মোনাজাত করেন –পিআইডি

জাতীয় শোক দিবস

১৫ই আগস্ট : জঙ্গিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে সারাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ডিএফপিতে জাতীয় শোক দিবস পালিত

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস' পালন করে। **প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক**

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ফরাসি সংস্করণ প্রকাশ

২৬শে মার্চ ২০১৭ প্যারিসে ফরাসি প্রতিষ্ঠান জিস্কো এডিটর প্রকাশিত *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র ফরাসি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এর প্রকাশক রেনালদ মন। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন প্রফেসর ফ্রান্স ভট্টাচার্য। এর ফরাসি সংস্করণের পাদটীকা লেখেন ফরাসি জাতীয় ভাষা ইনস্টিটিউট ইনালকোর বাংলা ভাষা ও সভ্যতার শিক্ষক জেরেমি কদ্রন। বইটির প্রকাশনা, ভাষাগত পরিশুদ্ধতা ও সর্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক ফরাসি রাষ্ট্রদূত চার্জ দ্য গল, ইনালকোর বাংলা বিভাগের প্রধান ড. ফিলিপ বেনোয়া ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফিলিপ রাত একযোগে কাজ করেন। বইটির ভূমিকা লেখেন ফ্রান্সের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুবার্ট ভেদ্রিন।

হিন্দিতে অনূদিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী

৮ই এপ্রিল ২০১৭ ভারতের নয়াদিল্লিতে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গ্রন্থটি বাংলা থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের নতুন ভাস্কর্য : বীর

রাজধানী ঢাকার নিকুঞ্জ-১ এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নতুন ভাস্কর্য 'বীর'। বনানী ওভারপাস এয়ারপোর্ট মোড়ে সৌন্দর্য বর্ধনের আওতায় ভিনাইল ওয়ার্ল্ড গ্রুপের নিজস্ব অর্থায়নে এটি স্থাপন করা হয়। এটির উচ্চতা ৫৩ ফুট। দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট ও প্রস্থ ৬২ ফুট। ভাস্কর্যটির মূল ডিজাইনার হাজ্জাজ কায়সার। বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর–স্লোগানের 'বীর' শব্দ থেকে

নতুন ভাস্কর্য 'বীর'

নামকরণ করা হয়েছে 'বীর' ভাস্কর্যটির। ভাস্কর্যটিতে রয়েছে পাক হানাদারবাহিনীর দিকে গ্রেনেড ছুড়ে মারা মুক্তিযোদ্ধা তরুণ আর সামনে অস্ত্র হাতে এগিয়ে যাচ্ছে নারী মুক্তিযোদ্ধা। রাইফেল তাক করে আছেন আরো দুইজন মুক্তিযোদ্ধা, পেছনে উড়ছে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পতাকা। **প্রতিবেদন: মো. লিয়াকত হোসেন ভূঞা**

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ইলিশ: জিআই পণ্যের স্বীকৃতি

মাছে-ভাতে বাঙালি আমরা। এ প্রবাদের সত্যতার প্রমাণ আমরা পেলাম। এছাড়া ইলিশ যে আমাদের জাতীয় মাছ তারও স্বীকৃতি এবার আমাদের হাতের মুঠোয়। কেননা ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে ইলিশ স্বীকৃতি পেয়েছে।

জামদানির পর ইলিশ স্বত্ব পেল প্যাটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ভৌগোলিক নির্দেশক (জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন) পণ্য হিসেবে ইলিশ নিবন্ধনের সব প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এ ব্যাপারে আপত্তি না করে তবে ইলিশের স্বত্ব এখন থেকে আমাদের। ওয়ার্ল্ড ফিশের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মোট ইলিশের ৬৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে, ভারতে ১৫ শতাংশ, মিয়ানমারে ১০ শতাংশ। আরব সাগর তীরবর্তী দেশগুলো এবং প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর তীরবর্তী দেশগুলোতেও ইলিশ ধরা পড়ে। ইলিশ আছে বিশ্বের এমন ১১টি দেশের মধ্যে ১০টিতেই ইলিশের উৎপাদন কমছে, একমাত্র বাংলাদেশেই বেড়েছে।

প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি

বিদায়ী অর্থবছরে প্রকৌশল খাতের পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৬৮ কোটি ৮৮ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা। যা গত বছরের তুলনায় ৩৫ দশমিক ০৫ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রমবাজার

উপসাগরীয় দেশগুলোর শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান ভারত ও পাকিস্তান থেকে ভালো। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে উপসাগরীয় দেশগুলোতে ভারতীয় শ্রমিক কমেছে ৩৫ শতাংশ। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এই তিন বছরে উপসাগরীয় দেশগুলোতে শ্রমিকের চাহিদা বেড়েছে সাড়ে ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালের প্রথম ৬ মাসের পরিসংখ্যান বলে, উপসাগরীয় দেশগুলোতে বর্তমানে প্রায় ৫০ শতাংশ শ্রমিকই বাংলাদেশি।

দুর্নীতি দমন কমিশনের হটলাইন

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)–এর হটলাইন ১০৬। ২৮শে জুলাই ২০১৭ তারিখে এক মিডিয়া সেন্টারের অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এ হটলাইন উদ্‌বোধন করেন। দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য দুদককে জানানোর জন্য এই হটলাইন চালু করা হয়েছে।

প্রথমবারের মতো কৃষিযন্ত্র সেবা কেন্দ্র

কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য করে তুলতে ৩০০ উপজেলায় ভাড়ায় পরিচালিত যন্ত্র সেবা কেন্দ্র চালু করেছে সরকার। প্রতিটি উপজেলায় একটি কৃষক গ্রুপ বা ক্লাব নির্বাচন করে সেখানে এক সেট কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট গ্রুপ বা ক্লাবের বাইরের কৃষকরা এ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারবে। এ ক্লাব বা গ্রুপে থাকবে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান। ফলে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ক্লাব বা গ্রুপের কার্যালয় তথ্য সেবা কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে। প্রাথমিকভাবে ৩০০ উপজেলায় শুরু হয়েছে ভাড়ায় চালিত এ সেবা কেন্দ্র। ধীরে ধীরে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করবে সরকার। **প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে

পরিবহণ, শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে দু'বছর আগে জাতিসংঘকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। এমন তথ্য উঠে

২৮শে জুলাই হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'ঢাকা পানি সম্মেলন ২০১৭'-এ ডেলটা কোয়ালিশন মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স ও ওয়ার্কিং গ্রুপের থিমেটিক সেশন অনুষ্ঠিত হয় –পিআইডি

এসেছে জার্মানভিত্তিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে। সংস্থাটি বলেছে, কার্বন নিঃসরণ কমাতে বাংলাদেশের নেওয়া ১১টি কৌশলের মধ্যে ৯টি কৌশল বাস্তবায়ন সঠিক পথেই রয়েছে। ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে ৭০। ভারত করেছে মাত্র ৩০। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য চারটি দেশের স্কোরও ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে।

২৪শে সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে মাইডাস সেন্টারে টিআইবির কার্যালয়ে 'জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে স্বপ্রণোদিত অঙ্গীকার ও প্রতিপালন : দক্ষিণ এশীয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ' শিরোনামে গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের (সিডি) পরিচালক ড. এ কে এনামুল হক।

বিদেশের বিভিন্ন মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় শোক দিবস পালিত

বিদেশের বিভিন্ন বাংলাদেশ মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, তাসখন্দ, ইস্তাম্বুল, রিয়াদ প্রভৃতি বাংলাদেশ মিশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর শোক দিবস উপলক্ষে কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

বিদেশে আরো সাত মিশন হবে

বিশ্বের সাতটি শহরে নতুনভাবে বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। একইসঙ্গে বিদেশে স্থাপিত ১৭টি বাংলাদেশ মিশনকে আগের তারিখ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ৭ই আগস্ট সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম প্রেস ব্রিফিং-এ বিষয়টি জানান।

তিনি জানান, সাত নতুন মিশন হবে আফগানিস্তানের কাবুল, সুদানের খার্তুম, সিয়েরালিয়নের ফ্রি টাউন, রোমানিয়ার বুখারেস্ট, ভারতের চেন্নাই, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও কানাডার টরেন্টোতে।

চার স্থলবন্দর উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক দেবে ৫৯৩ কোটি টাকা

সিলেটের শেওলা, সাতক্ষীরার ভোমরা, যশোরের বেনাপোল ও খাগড়াছড়ির রামগড়–এই চার স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব স্থলবন্দর উন্নয়নে মোট ব্যয় হবে ৬৯৩ কোটি টাকা। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ হিসেবে বিশ্বব্যাংক দেবে প্রায় ৫৯৩ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ১০০ কোটি টাকা সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এ সংক্রান্ত 'বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। **প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন**

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ-১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

ছাগল ভেড়া মহিষ পালনেও ৫% সুদে ঋণ দেবে সরকার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি হচ্ছে– একটি বাড়ি একটি খামার। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজস্ব পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন। প্রধানমন্ত্রী ১৪ই জুলাই তাঁর কার্যালয়ে দেশি ভেড়ার পশম, পাট ও সুতার মিশ্রণে তৈরি পণ্যসামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অনুষ্ঠানে বলেন, তাঁর সরকার এখন থেকে ছাগল, ভেড়া ও মহিষ পালনকারীদেরও ৫ শতাংশ হারে ব্যাংক ঋণ সুবিধা দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে। তিনি বলেন, 'গাভী পালনে আমরা যদি ৫ শতাংশ সুদে ঋণ দিতে পারি, তাহলে ভেড়া, ছাগল ও মহিষ এগুলোতে দিতে পারব না কেন? দিলে মানুষ আরো উৎসাহিত হবে। গরু-ছাগল কোরবানি দেওয়ার পাশাপাশি ভেড়া কোরবানি দেওয়ায় উৎসাহিত করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি ভেড়ার পশম, পাট ও সুতার মিশ্রণে তৈরি সামগ্রী বাজারজাতকরণের নির্দেশ দেন এবং দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশেও পাঠানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্যোগ-৬ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

দেশে আরো ২২টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে

দেশে আগামী চার বছরে ২২টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে সরকার। এরমধ্যে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাতটি, বেসরকারি অর্থায়নে সাতটি এবং সরকারি-বেসরকারি যৌথ ব্যবস্থাপনায় আরো আটটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এ তথ্য মিডিয়াকে জানিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৩০ শতাংশই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ তুলনামূলক অনেক কম এবং এর কাঁচামাল বেশ সহজলভ্য। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিশেষ সহায়তা করবে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কেরানীগঞ্জে

কেরানীগঞ্জে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে ২০১৮ সালে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র উদ্‌বোধন করা হবে। সম্প্রতি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ ছাত্রলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, কেরানীগঞ্জে সব বিদ্যুতের লাইন মাটির নিচে স্থাপন করা হবে। উপজেলা হিসেবে কেরানীগঞ্জে প্রথম এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

মাতারবাড়িতে আরো একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে

মাতারবাড়িতে আরো ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে সরকার। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি এ লক্ষ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) কাছ থেকে অর্থ সহায়তা নেওয়ার জন্য কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে একটি বন্দর নির্মাণসহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ৪.৫৯ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে জাইকার সঙ্গে।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্র থেকে জানা যায়, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩ এবং ৪ নম্বর ইউনিট হিসেবে কেন্দ্রটিকে নির্মাণ করা হবে। কেন্দ্রটির দুটি ইউনিটের পৃথকভাবে ক্ষমতা হবে ৬০০ মেগাওয়াট অর্থাৎ এর মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, ভবিষ্যতে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ হাব দিয়েই সারাবিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে চিনবে।

ঋণ সুবিধা পেতে আইন সংশোধনের প্রয়োজন নেই

বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ প্রকল্পে বড়ো অঙ্কের ঋণ সুবিধা দিতে 'ব্যাংক কোম্পানি আইন' সংশোধন করতে হবে না। বিদ্যুৎ খাতে বড়ো অঙ্কের ঋণের জন্য আইনি বাধা যাচাইয়ে গঠিত কমিটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে ২৫ শতাংশের বেশি ঋণ দেওয়া যাবে কি-না, ব্যাংক কোম্পানি আইন বা অন্য কোনো আইন, বিধি বা নীতিমালা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে কি-না তা যাচাইয়ে ৪ঠা জুলাই ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ (২০১৩ সালে সংশোধিত)-এর ২৬ খ(১) ধারা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে একটি ব্যাংকের মোট মূলধনের ২৫ শতাংশের বেশি ঋণ দেওয়া যাবে না।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের দরকার নেই বলে বেশিরভাগ সদস্য মত দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন ব্যাংক কোম্পানি আইনেরই ২৬খ(৩) ধারায় সরকার নিশ্চয়তা দিলে মূলধনের ২৫% ঋণসীমা রাখার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের।

উদ্যোগ-৯ বিনিয়োগ বিকাশ

২০ হাজার ৪০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ বরাদ্দ

চলতি অর্থবছরে কৃষকদের জন্য ২০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ রেখেছে ব্যাংকগুলো। কৃষক ছাড়াও পোলট্রি শিল্প, দুগ্ধ উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে এসব ঋণ পাওয়া যাবে। ২৭শে জুলাই কৃষি ও পল্লিঋণ নীতিমালা ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই নীতিমালা ঘোষণা করেন ডেপুটি গভর্নর এসএম মনিরুজ্জামান।

৯ মাসে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ১৯৬ কোটি ডলার

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) কাছে দেশি, যৌথ ও বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধন বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ তিন ধরনের বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে ২ হাজার ৩২৫ কোটি ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে ৬৬ শতাংশ বেশি। বিডা-র সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী,বিগত অর্থবছরে ১ হাজার ৭৪৫টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে ৮৩টি বেশি। এসব প্রকল্পে মোট ২ লাখ ৭৮ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে দেশি বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে ১ হাজার ২৪৯ কোটি ডলারের, যা আগের বছরের চেয়ে ২১ শতাংশ বেশি। ১ হাজার ৫৭৮টি প্রকল্পে এসব বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এতে কর্মসংস্থান হবে ২ লাখ ২২ হাজার লোকের। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে ১ হাজার ৭৬ কোটি ডলারের, যা আগের বছরের চেয়ে ৮৮০ কোটি ডলার বেশি। ১৬৭টি প্রকল্পে এসব বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। আগের বছরের চেয়ে প্রকল্প সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১৬টি। এসব বিনিয়োগ প্রস্তাবে ৫৭ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বিডা-র পরিচালক তৌহিদুর রহমান খান বলেন, এ হিসাব শুধু বিডা-য় নিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রস্তাবের। **প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম**

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬

‘টেকসই উন্নয়নে পানি’ শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া এবং ডেল্টা কোয়ালিশনভুক্ত অঞ্চলের ২৭ দেশের অংশগ্রহণে ‘টেকসই উন্নয়নে পানি’ শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী। ২৯শে জুলাই হোটেল সোনারগাঁও-এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ২৭ দেশের মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রীসহ ৮২ বিদেশি প্রতিনিধি অংশ নেন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য নিরাপত্তাসহ এসডিজি’র ৭টি লক্ষ্য সামনে রেখে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার ইতোমধ্যে বিশেষ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এমডিজি অনুযায়ী, ২০১৫ সালের মধ্যে ৮৪% মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল। ২০১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ৮৭% মানুষ নিরাপদ পানির আওতায় এসেছে। এসডিজি’র নির্ধারিত সময়সীমা ২০৩০ সালের আগেই শতভাগ মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার এবং ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার কথা বলেন। ২০২১ সাল নাগাদ তাঁর সরকার ভূগর্ভের পানির ব্যবহার কমিয়ে বিভাগীয় সদরে ভূ–উপরিস্থিত নিরাপদ পানি সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৮

টানা তিন বছর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

গত দুই অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও স্মরণকালের সেরা প্রবৃদ্ধি অর্জন করে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। রাজস্ব আয়ে গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যেখানে ১০০ টাকা আদায় করা হয়েছিল, সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১১৯ টাকা আদায় হয়েছে।

২৬শে জুলাই রাজধানীর সেগুনবাগিচায় এনবিআরের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে রাজস্ব আদায়ের এসব তথ্য তুলে ধরেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান। এ সময় এনবিআরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গত অর্থবছরের বাজেটে এনবিআরের মাধ্যমে কর হিসেবে ২ লাখ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও পরে সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ১ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর বিপরীতে সদ্য বিদায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকার রাজস্ব আদায় করেছে এনবিআর। যা সংস্থাটির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি। অন্যদিকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৫১৮ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করেছিল এনবিআর। সেই হিসাবে রাজস্ব আদায়ে ১৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এর আগের ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এনবিআর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১৪ দশমিক ৬০ এবং ১২ দশমিক ৩২ শতাংশ। এনবিআর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান বলেন, টানা তিন অর্থবছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি রাজস্ব আহরণের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

রফতানি আয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে বছর শুরু

আগের বছরের প্রথম মাসের চেয়ে এবার রফতানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জুলাইয়ে আয় বেড়েছে ২৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়েছে শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ। গতকাল রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদন সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইতে ৩২০ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ। আর গত বছরের জুলাই মাসে রফতানি আয় ছিল ২৫৩ কোটি ৪৩ লাখ ১০ হাজার ডলার। যা চলতি অর্থবছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ কম। প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়েছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সব ধরনের পণ্য রফতানিতে আয় হয়েছিল ৩ হাজার ৪৬৫ কোটি ৫৯ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ হাজার ৭৫০ কোটি ডলার।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১১

ঢাকাকে উন্নত দেশের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হবে

ঢাকাকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশের রাজধানী এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের রাজধানী হিসেবে ধারাবাহিকভাবে গড়ে তোলা হবে। কর্মসংস্থান, বৈদেশিক বিনিয়োগ, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক বিষয়ে ঢাকার কর্মকাণ্ড সারাদেশে প্রতিফলিত হয়। ঢাকার জনসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা ৩ কোটি অতিক্রম করবে। ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাতে সরকার সব সেবা সংস্থাগুলোকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন হোটেল সোনারগাঁওয়ে ১৯শে জুলাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ আয়োজিত ‘ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মিটিং অন টোয়ার্ডস গ্রেট ঢাকা’ শীর্ষক সভার উদ্‌বোধন সেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ঢাকার চারপাশের নদীসমূহকে দূষণমুক্ত ও দখলমুক্ত করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কাজ করছে এবং ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

সভায় বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ কান্ট্রি ডিরেক্টর Qimiao Fan, বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় প্রধান অর্থনীতিবিদ Martin Rama সহ সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১২

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

২০১০ সাল থেকে ৯ই আগস্ট দেশে ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস’ পালিত হয়ে আসছে। এবারো নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় দিবসটি। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ গড়তে ও সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে উন্নয়নের অপরিহার্য নিয়ামক ‘জ্বালানি নিরাপত্তা’ নিশ্চিত করতে বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তির ফলে দেশের জ্বালানি খাতে যে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা কাজে লাগাতে সমুদ্রে অনুসন্ধান চলছে। গ্যাস সংকট মোকাবিলায় নেওয়া হয়েছে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার না হওয়ায় যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যই সরকারের এই উদ্যোগ। জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। এ লক্ষ্যে ৫টি টার্মিনাল নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৩০শে জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন অনুষদ অডিটোরিয়ামের রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, দেশের একটা বড়ো অংশ তরুণ সমাজ এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে উল্লেখ করেন। পরে মন্ত্রী ২০০৯ থেকে ২০১৬ সালে বাংলা ও ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ১৭ শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্রপতি পদক ও নগদ টাকা এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীদের পদক ও নগদ টাকা প্রদান করেন।

যথাসময়ে পাঠ্যবই তৈরির কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৩১শে জুলাই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বছরের শুরুতে প্রথম থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে বোর্ডের পাঠ্যবই তুলে দিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন। পরে তিনি বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং এনসিটিবি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২রা আগস্ট ২০১৭ শিক্ষা ভবনের ডিআইএ সভাকক্ষে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ই-ফাইলিং ও গণশুনানি কার্যক্রম-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

অনলাইন গণশুনানি এবং ডিআইএ'র ই-ফাইলিং কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২রা আগস্ট শিক্ষা ভবনে ডিআইএ'র কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন গণশুনানি এবং ডিআইএ'র ই-ফাইলিং কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। এ সময় তিনি প্রাথমিকভাবে ১১টি জেলায় ১১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণশুনানি ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেন। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো অধিদপ্তর বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো কাজে কোথাও ঘুষ না দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যারা ভালো কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং দুর্নীতির সঙ্গে যাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে তাদের সর্বনাশ হবে। মন্ত্রী প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানোর এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কাজকে আরো গতিশীল করার আহ্বান জানান। **প্রতিবেদন : মো. সেলিম**

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড পেলেন সায়মা ওয়াজেদ

বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ 'ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন। অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অ্যাডভাইজরি প্যানেলেরও বিশেষজ্ঞ। প্রিন্সটন ক্লাব অব নিউইয়র্ক আয়োজিত 'সিমা কলাইনু' নামে নিউইয়র্ক ভিত্তিক একটি শিশু অটিজম কেন্দ্র ও স্কুল এবং এর আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'আই কেয়ার ফর অটিজম' এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। সায়মা ওয়াজেদের পক্ষে অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন।

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণকালে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অটিজম ও অন্যান্য নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত মানুষের অধিকার রক্ষা এবং কল্যাণে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সায়মা ওয়াজেদকে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারের ক্ষেত্রে 'গ্লোবাল রিনাউন্ড চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া সংস্থাটির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ে এ অঞ্চলের ১১টি দেশের জন্য সায়মা ওয়াজেদকে অটিজম বিষয়ক 'শুভেচ্ছা দূত' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে সায়মা ওয়াজেদ একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠান।

সিমা কলাইনু ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্কের প্রথম শিশু অটিজম কেন্দ্র ও স্কুল। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নিউইয়র্কের ৫টি পৌর এলাকার সকল সম্প্রদায়ের অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত সহস্রাধিক শিশুকে হোম সার্ভিস দিয়েছে। **প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার**

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়াই ভালভ স্থাপন

ওপেন হার্ট সার্জারি বা হৃদযন্ত্র না কেটে ৮৫ বছর বয়সি এক রোগীর হৃদপিণ্ডে কৃত্রিম ভালভ লাগানো হয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের অস্ত্রোপচার এটাই প্রথম। ২৫শে জুলাই ইউনাইটেড হাসপাতালে এ অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

৩০ শে জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক মানুষের হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা কমে যায়।

ভালভ নড়াচড়া করার প্রয়োজনীয় নমনীয়তা থাকে না। এক্ষেত্রে কৃত্রিম ভালভ সংযোজন একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। হৃদযন্ত্র কেটে উন্মুক্ত করে ভালভ লাগানো হয়। কিন্তু বেশি বয়সি রোগী অস্ত্রোপচারের ধকল সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের জন্য 'ট্রান্সক্যাথেটার এওর্টক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট' (রক্তনালির ভেতর দিয়ে ভালভ প্রতিস্থাপন) পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এটাই আধুনিক পদ্ধতি।

শিশুদের ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো হয়েছে

দেশের ২ কোটি ২৫ লক্ষ শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে ৫ই আগস্ট। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা শিশুদেরকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ান।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ২রা আগস্ট ২০১৭ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন –পিআইডি

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা ৬ই অক্টোবর

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। আর বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা হবে ৩০শে নভেম্বর। ২রা আগস্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জমি পাচ্ছে ২৫টি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

দেশের ২৫টি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট বা এপিআই শিল্পপার্কে জমি বরাদ্দ পাচ্ছে। ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে এ শিল্পপার্ক প্রতিষ্ঠা করছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এতে ওষুধের কাঁচামালের আমদানি নির্ভরতা কমবে।

মুন্সিগঞ্জের বাউশিয়ায় প্রায় ২০০ একর জমিতে এপিআই শিল্পপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ পার্কে ৪২টি প্লট থাকছে কারখানা নির্মাণের জন্য। প্লটগুলো কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে, তা ঠিক করে দিয়েছে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি। সেটি যাচাই–বাছাই করে শিল্প মন্ত্রণালয় বেক্সিমকো, ইনসেপটা, স্কয়ার, গ্লোব, অ্যারিস্টোফার্মা, অপসোনিনসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে একাধিক প্লট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশের ওষুধের মান উন্নত বলেই রপ্তানি হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের আইন খুব কড়া। বাংলাদেশের ওষুধের মান উন্নত বলেই যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। নকল–ভেজাল ওষুধ বিক্রি বা মানহীন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বর্তমান সরকার। ২রা আগস্ট রাজধানীর প্রথম আলো কার্যালয়ে 'জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে জাতীয় ঔষধ নীতি ২০১৬' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন। সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও প্রথম আলো যৌথভাবে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

প্রয়োজনীয় ওষুধের ৯৮ শতাংশ দেশেই তৈরি হচ্ছে। ১৪০টি দেশে ওষুধ রপ্তানিও হচ্ছে। তবে দেশের মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ নিশ্চিত করতে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি বাজারে নজরদারি জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন বৈঠকে উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তা, ওষুধ শিল্প মালিক ও ওষুধ বিশেষজ্ঞরা।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু

ডিজিটাল পর্দায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তর্জনী উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নেপথ্যে তাঁর সেই অনুকরণীয় বজ্রকণ্ঠ। শিল্পকলায় জাতীয় নাট্যশালার সুপরিসর মিলনায়তনজুড়ে তৈরি হয় যেন সেই ৭ই মার্চের আবহ। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে চলে 'শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। সেই ধারাবাহিকতায় দুই দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের শেষ দিনে ১৬ই আগস্ট ছিল নৃত্যগীত, নাটকের কোরিওগ্রাফি, আবৃত্তি ও গান। আলোচনা পর্বে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন সৌমিত্র শেখর ও আফরোজা জামিল। পরে সাংস্কৃতিক পর্বে ছিল গান, আবৃত্তি ও বিভিন্ন নাট্যদলের নাটকের কোরিওগ্রাফি পরিবেশনা।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে 'শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা পাঠ

এসরাজ আর বাঁশির সুরের সঙ্গে হলো কবিতা পাঠ। আসরের সবগুলো কবিতাই ছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। 'শ্রাবণের শোকগাথা' শিরোনামে ১১ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা পাঠের এ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে শিল্পকলা একাডেমি। এতে সহযোগিতা করে আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ। একাডেমির জাতীয় সংগীত, নৃত্যকলা ও আবৃত্তি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে কবিতা পাঠ করেন বাচিক শিল্পীরা।

জাদুঘরের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতীয় জাদুঘরের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় ৭ই আগস্ট

জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে। এ উপলক্ষে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ১০৪ বছর : প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত' শীর্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।

হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ একাধারে ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোটো গল্পকার, নাট্যকার এবং গীতিকার। নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও তিনি সমাদৃত ছিলেন। নন্দিত এ কথা সাহিত্যিকের পঞ্চম প্রয়াণবার্ষিকী ছিল ১৯শে জুলাই। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ম্যাড মেটার বিশেষ নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে ২১শে জুলাই। এ দিন শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে মঞ্চায়ন হয় হুমায়ূন আহমেদের *কে কথা কয়* উপন্যাস অবলম্বনে 'নন্দিউ নতিম' নাটকের বিশেষ প্রদর্শনী। নাটকটি রচনা ও নির্দেশা দেন আসাদুল ইসলাম। এর আগে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

উদীচীর জহির রায়হান স্মরণ

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯শে আগস্ট ফেনী জেলায় মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী 'প্রতিরোধে প্রস্তুত ক্যামেরা' স্লোগান নিয়ে ১৮ই আগস্ট আয়োজন করে দুই দিনব্যাপী 'জহির রায়হান চলচ্চিত্র উৎসব'। ১৮ই আগস্ট বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদ আয়োজিত এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি সফিউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ শীশ।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশি প্রশিক্ষিত আইটি কর্মী নেবে জাপান

জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার (জাইকা) অর্থায়নে তিন বছর মেয়াদি এক প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইটি প্রফেশনালদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে জাপানে নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বাংলাদেশে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

২৮শে জুলাই মিয়াজাকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাপানের আইটি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের জাইকা অর্থায়নের এই পাইলট প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। জাইকা ও মিয়াজাকি বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এই সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। উপস্থিত বক্তাদের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে, ফলে দুই দেশের যৌথ প্রচেষ্টা আরো বেগবান হবে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতির মাধ্যমে আইটি কর্মী নেওয়ার প্রকল্প একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবে যা অন্যান্য খাতের জন্য অনুকরণীয় হবে।

এইচএসবিসি আনল আমদানি-রপ্তানি সহায়ক অ্যাপ

বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক লেনদেনের তাৎক্ষণিক তথ্য দিতে সক্ষম একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে বহুজাতিক ব্যাংক দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন বা এইচএসবিসি বাংলাদেশ। পণ্য আমদানির জন্য খোলা ঋণপত্রের (এলসি) সর্বশেষ অবস্থান এবং পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যাবে বিশেষ এই অ্যাপের মাধ্যমে। এই মোবাইল অ্যাপটির নাম 'এইচএসবিসি-নেট ট্রেড ট্রানজেকশন ট্র্যাকার'।

শুরু হচ্ছে মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধন

মোবাইল হ্যান্ডসেট চুরি, ছিনতাই, জঙ্গি তৎপরতাসহ বিভিন্ন অপরাধ ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিটিআরসি মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধন ব্যবস্থা চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী দুমাসের মধ্যে এ নিবন্ধন শুরুর কথা রয়েছে।

নিবন্ধন চালু হলে মোবাইলের আইএমইআই নম্বর নির্দিষ্টকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট নম্বরের হ্যান্ডসেট ছাড়া অন্য কোনো হ্যান্ডসেট ব্যবহার করা যাবে না। নিবন্ধন চালু হলে ব্যবহৃত মোবাইল সেটগুলোকে ৫০ টাকার বিনিময়ে আইএমইআই নম্বর দেওয়ার পরিকল্পনা আছে বিটিআরসি'র। এ পদ্ধতি চালু হলে দেশে অবৈধভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটের অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে, হ্যান্ডসেট চুরি রোধ করা যাবে ও চুরি হওয়া সেট টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হবে এবং তা পুনরুদ্ধারও সহজ হবে।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সূচনা

মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার উড়ালপথ এবং নয়টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। গত ২রা আগস্ট আগারগাঁও এলাকায় নির্মাণকাজের সূচনা করেন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

প্রথম পর্যায়ে ১২ কিলোমিটার উড়ালপথ এবং উত্তরা-উত্তর, উত্তরা-সেন্টার, উত্তরা-দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০,

সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ২রা আগস্ট ২০১৭ আগারগাঁওয়ে মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্পের প্যাকেজ ৩ ও প্যাকেজ ৪-এর ভায়াডাক্ট ও স্টেশন নির্মাণ কাজ ঘুরে দেখেন -পিআইডি

কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া এবং আগারগাঁও-এ স্টেশন নির্মাণ করা হবে। ২০১৯ সালের মধ্যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে এবং ২০২০ সালের মধ্যে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শেষ হবে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'মেট্রোরেলের রুট এবং স্টেশন নির্মাণের মধ্য দিয়ে আমরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আরো একধাপ এগিয়ে গেলাম'। তিনি আরও বলেন, ইতোমধ্যে ডিপো নির্মাণ এবং ডিপো এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল প্রকল্পে জাইকার প্রকল্প সহায়তা প্রায় ১৬,৬০০ কোটি টাকা। ৮টি প্যাকেজে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সকল প্যাকেজের দরপত্রও আহ্বানের কাজ শেষ হয়েছে। ৬টি প্যাকেজের আওতায় প্রায় ৪,২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ কিলোমিটার উড়ালপথ এবং ৯টি স্টেশন নির্মিত হতে যাচ্ছে। **প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু**

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

গাছে গাছে লোভনীয় মাল্টা

সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলছে ফিকে সবুজ বর্ণের লোভনীয় মাল্টা। সাধারণত জুন মাসে মাল্টা গাছে ফুল আসে এবং অক্টোবর মাসের দিকে পাকে। দিনাজপুরের বীরগঞ্জের কৃষকের মনে আশা জাগিয়েছে রঙিন মাল্টা। ভৌগোলিক কারণে এ এলাকায় মাল্টা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ।

কমলা চাষের সাফল্যের পর এবার মাল্টা চাষের দিকে ঝুঁকছে বীরগঞ্জের কৃষক। প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষকদের সার্বিক সহায়তা দিয়ে আসছে কৃষি বিভাগ। এর ফলে অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধিত হবে বলে আশা করছেন কৃষি বিভাগসহ উদ্যোক্তারা। মাল্টার দাম বেশি। চাষাবাদে তেমন ঝামেলা নেই। সেই সাথে সাথি ফসল হিসেবে সবজিসহ বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা যায়।

অন্যদিকে, শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের ঢালের বাগানে মাল্টার ব্যাপক ফলন হয়েছে। ৫–৬ ফুট উচ্চতার ডালপালা আর ফলের আকৃতি ও গঠন বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করা মাল্টা অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট এবং রসালো। বারি মাল্টা-১ নামের উন্নত জাতের মাল্টা চাষ করে সফল হয়েছেন এ উপজেলার প্রায় চার শতাধিক কৃষক। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে মাল্টার এ উন্নত জাত আবিষ্কার করেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় এখন এটি ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে চাষিদের বাগানে মাল্টা

ফিরছে পাটের সুদিন

দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততাকে জয় করল পাট। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৮ জেলায় মোট কৃষি জমির পরিমাণ ২৮ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর। এরমধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৩০ শতাংশ। চাষযোগ্য এ জমির মধ্যে ১০ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে এ লবণাক্ততার পরিমাণ। ফলে প্রতিবছর খরিফ-১ মৌসুমে এ বিশাল পরিমাণ জমি পতিত পড়ে থাকে।

পতিত এ জমিতেই গত দু'বছর ধরে বিজেআরআই উদ্ভাবিত লবণসহিষ্ণু দেশি পাট-৮ চাষ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন কৃষক। লবণসহিষ্ণু আমন ধান চাষে সফলতার পর পাট চাষে এ সফলতা কৃষকদের নতুন করে আশাবাদী করে তুলেছে। ফলে এখন আর লবণাক্ত জমি পতিত থাকবে না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন একটি সময়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে পাট চাষে সফলতা এসেছে যখন দেশে ১৭টি পণ্যে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে যে অতিরিক্ত ২০ থেকে ২২ লাখ বেল পাটের চাহিদা তৈরি হয়েছে, তা দক্ষিণাঞ্চলে পাট আবাদের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হবে। পাবনা জেলা কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি বছর এ জেলায় ৪৫ হাজার ৭৪ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে। পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৫০ হাজার বেল।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

শান্তিচুক্তি পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের মাইলফলক

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি এ অঞ্চলের উন্নয়নের মাইলফলক। এ চুক্তির ফলে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, কৃষি ও আর্থসামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২২শে জুলাই থানচি কলেজের উদ্‌বোধনকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে ২ কোটি ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ফায়ার সার্ভিস ভবন, ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ে থানচি উপজেলা পরিষদের রেস্ট হাউজ ও ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে পরিষদ ভবন সংস্কার কাজের উদ্‌বোধন করেন।

বান্দরবানে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ

ঘূর্ণিঝড় মোরা'য় ক্ষতিগ্রস্ত বান্দরবান পৌরসভার ৮৯টি পরিবার ও সুয়ালক ইউনিয়নের ১১টি পরিবারকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির

উদ্যোগে পরিবার প্রতি নগদ ৪ হাজার টাকা ও ঘর মেরামতের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, নির্বিচারে বন উজার, অতিবৃষ্টি তথা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সহযোগী সংস্থাও, যা আর্তমানবতা ও সম্প্রদায়িক সম্প্রতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম ও ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে পার্বত্য এলাকার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। **প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন**

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ পানি পাবে শতভাগ মানুষ

দেশের বিভাগীয় সদরগুলোতে ২০২১ সাল নাগাদ ভূ-উপরিস্থিত নিরাপদ পানি সরবারাহ এবং ২০৩০ সালের আগেই দেশের শতভাগ মানুষকে নিরাপদ পানির আওতায় আনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে ঢাকা ওয়াটার কনফারেন্স ২০১৭-র অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। তিন দিনব্যাপী 'ঢাকা পানি সম্মেলন'– এ তিনি আরো বলেন, এখনো বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষের সুপেয় পানির প্রাপ্য নিশ্চিত করা যায়নি। কিন্তু ২০১৫ সালে বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানির আওতায় এসেছে। আমরা ২০৩০ সালের মধ্যেই জাতিসংঘ ঘোষিত 'সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করব। নিরাপদ পানির অভাবে পৃথিবীতে বছরে ১০ লাখ লোক মারা যায়, যাদের অধিকাংশই শিশু। প্রতিদিন গড়ে বিশ্বে এক হাজার শিশু বিশুদ্ধ পানির অভাবে প্রাণ হারায়। বিশ্বের প্রায় ১০৭ কোটির বেশি মানুষ নদী অববাহিকায় বসবাস করেও পানির চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। পৃথিবীর এই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই মরক্কো মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলনে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে পানি ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে আলাদা তহবিল গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের সব ধরনের উন্নয়নের সঙ্গে নদনদী ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশের মূল সমস্যা হচ্ছে আর্সেনিক ও লবণাক্ততা, অপচয় এবং শিল্প বর্জ্যসহ নানা কারণে পানি দূষণ। এসব সমস্যা মোকাবিলা করতে সরকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কার্যকর করে যাচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় শতবর্ষের ডেল্টা পরিকল্পনায় ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও পানির বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সমতল, পাহাড় ও উপকূলীয় এলাকাগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনার আওতায় নেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী ১২টি দেশের সহযোগিতায় ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনায় সরকার গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন, ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অ্যাক্ট-১৯৯৬ প্রণয়ন, ন্যাশনাল ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন অ্যাক্ট-২০১৪ প্রণয়ন এবং আর্সেনিক সমস্যা মোকাবিলায় 'ন্যাশনাল পলিসি ফর আর্সেনিক মিটিগেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান' প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে। আর পানির সমস্যা সমাধানে লবণাক্ত পানি প্রধান এলাকায় পুকুরের পানি ফিল্টার করে লবণাক্ততা মুক্ত করা হয়েছে ৭ হাজার পুকুর এবং গভীর কূপ খনন করা হয়েছে ৩২ হাজার ৬শটি। বর্ষার পানি সংরক্ষণে ৪ হাজার ৭শ জলাধার তৈরি করা হয়েছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ সকল বিভাগীয় শহরের নিরাপদ পানি ভূ-উপরিস্থ পানি থেকে নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি-৬–এ অন্তর্ভুক্ত পানি সংক্রান্ত বৈঠকের তিনটি অংশের একটি এই পানি সম্মেলন। ১২ দফাসহ বিশ্বের শতভাগ মানুষ যেন নিরাপদ পানি পায় এই ব্রত নিয়েই শেষ হয় তিন দিনব্যাপী পানি সম্মেলন।

২৯শে জুলাই ২০১৭ হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'ঢাকা পানি সম্মেলন ২০১৭'-এ বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঢাকার মহাখালীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সভাকক্ষে আয়োজিত হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর (ডিডিএম) এবং ফুড অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টার্স ফোরামের (এফডিএসআরএফ) যৌথ আয়োজনে ঢাকায় কর্মরত সংবাদকর্মীদের নিয়ে এই কর্মশালা হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের ৩১ জন প্রতিবেদন এতে অংশ নেন। কর্মশালার প্রথমদিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের আইনি কাঠামো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল নিয়ে আলোচনা হয়। আয়োজনের দ্বিতীয়

দিনে দুর্যোগে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সাড়া দান, শহরে দুর্যোগ ও নগর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা, ঝুঁকি হ্রাসে সহনশীল বাংলাদেশ নির্মাণে সরকারি উদ্যোগ ও সমন্বয় বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়। কর্মশালায় দেশের অতীত ও বর্তমান বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। পাশাপাশি দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও গৃহীত কার্যক্রম এবং পূর্বাভাসের মাধ্যমে তার ক্ষতি এড়ানো সম্ভব বলে আলোচকরা মত দেন।

গোপালগঞ্জে এক লাখ বৃক্ষরোপণ

গোপালগঞ্জে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার ৫ উপজেলায় বৃক্ষরোপণ অভিযানে অন্তত এক লাখ বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয় বিভিন্ন পেশার মানুষ। গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগিয়ে ৫ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযানের শুভ সূচনা করেন।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

নিউইয়র্কে প্রথম বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ওয়াল স্ট্রিটে কাজ করা প্রথম বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তা দূরীন শাহনাজ। সম্প্রতি সেখানকার সাময়িকী *ফোর্বস*-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয়, দূরীন শাহনাজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার নারীর ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছেন। স্টক এক্সচেঞ্জে তিনি উইমেন্স লাইভলিহুড বন্ড নামে একটি বন্ড তালিকাভুক্ত করেছেন। এটি বিশ্বের প্রথম সামাজিকভাবে টেকসই বন্ড। এর দ্বারা কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনামের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রাহক নারী উদ্যোক্তাসহ বড়ো উদ্যোক্তারাও উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য, গত মার্চে দূরীন শাহনাজ মর্যাদাপূর্ণ 'বিজনেস ফর পিস' পুরস্কার পেয়েছেন।

ম্যারি কুরি বৃত্তি পেলেন রাশিদা হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বায়োমেডিক্যাল ফিজিকস অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের ম্যারি কুরি গবেষণা বৃত্তি পেয়েছেন রাশিদা হক। ৬ই আগস্ট এই বিভাগের মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২৭শে জুলাই ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে 'ফিরোজা বেগম স্বর্ণপদক' প্রদান করেন উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

২০১৫ সালের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী তিনি। বৃত্তির আওতায় রাশিদা এই বিভাগে পিএইচডি গবেষণার সুযোগ পাবেন। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স প্রোগ্রামের (আইএসপি) জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই বৃত্তি দেওয়া হয়।

ফিরোজা বেগম স্বর্ণপদক পেলেন রেজওয়ানা চৌধুরী

'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ২০১৭' এবার লাভ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপারসন ও রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। ২৭শে জুলাই নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পদক প্রদান করা হয়।

উপমহাদেশের স্বনামধন্য শিল্পী ফিরোজা বেগমের জন্মদিনে তাঁর স্মরণে এসিআই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গত বছর এ পদক প্রবর্তন করে ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড।

দুই নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট পেল ইরান

ইরানে মাসুমেহ এবতেকার ও লায়া জোনেইদি নামে দুই নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ৯ই আগস্ট ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এ নিয়োগ দিয়েছেন। আরেক নারী শাহিনদখত মোলাভেরদিকে তিনি নাগরিক অধিকার বিষয়ক সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

দুই নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে পরিবার ও নারী বিষয়ক দপ্তর এবং আইন বিষয়ক দপ্তর পেয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র একজন নারী মন্ত্রিসভার সদস্য হতে পেরেছেন। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

তিন লাখ গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হবে

মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা বাসস্থানের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের দুই লাখ ৮০ হাজার গৃহহীন মানুষকে পুনর্বাসন করার কাজ চলছে। ১৯৯৭ সালের ১৯শে মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং সব গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিনটি ফেজে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২), আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০২-২০১০), আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (২০১০-২০১৭) মোট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৯০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩ হাজার ৯৭৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৯ (সংশোধিত) মেয়াদে দুই লাখ ৮০ হাজার গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৫০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে নিজ জমিতে ঘর করে দেওয়া হবে এবং ২০ হাজার পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে। পরবর্তীতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১ লাখ ১০

হাজার গৃহহীন পরিবারকে নিজ জমিতে ঘর করে দেওয়া হবে এবং ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে। পরবর্তীতে ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে ১ লাখ ১০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে নিজ জমিতে ঘর করে দেওয়া হবে এবং ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে। বর্তমানে যার সামান্য জমি আছে কিন্তু ঘর করার সামর্থ্য নেই সেসব পরিবারকেও তাদের নিজ জমিতে ১ লাখ টাকা ব্যয়ে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হবে। এই কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৭০ হাজার পরিবারকে নিজ জমিতে ঘর তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, 'ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল এবং অসহায় মানুষের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার ৫ ইউনিটের পাকা ব্যারাকে ও দেশের অন্যান্য এলাকায় ৫ ইউনিটের সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া নদী ভাঙন এলাকায় সহজে স্থানান্তরযোগ্য সিআইসিট ব্যারাক নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ১৪ দিনের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে পরিবার প্রতি ৩০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়। পুনর্বাসিতদের জন্য ২ মাসব্যাপী ভিজিএফ সুবিধা প্রদান করা হয়।

পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রী যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল রেজিস্ট্রি ও নামজারি করা হয়। পুনর্বাসিতদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রকল্প গ্রামের তথ্য সংরক্ষণে ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ঈদের আগে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা সাড়ে ৫২ হাজার টাকা ভাতা পাবেন। গত ঈদের বকেয়া উৎসব ভাতা, ৩ মাসের সম্মানী ভাতা এবং আগামী ঈদুল আজহার উৎসব ভাতাসহ প্রত্যেকে এই টাকা পাবেন। ৬ই আগস্ট ২০১৭ তারিখে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর কক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মন্ত্রী এ তথ্য জানান।

দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

রংপুরের পীরগঞ্জে গত ২৪শে জুন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত-আহত শ্রমিকদের স্বজনদের মাঝে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে সাড়ে ১৬ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২৬শে জুলাই লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক নিহত-আহত শ্রমিকদের স্বজনদের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেন। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সরকার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করেছে। এ তহবিলে বর্তমানে জমার পরিমাণ ২২৭ কোটি টাকা। গত বছর জুলাই থেকে এ তহবিলে প্রায় ৫০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। শ্রমিকদের সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা এবং গার্মেন্ট শ্রমিকদের সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পীরগঞ্জ সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী নিহত-আহত শ্রমিকদের মাঝে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করেন।

ডিজিটালাইজড হবে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগী নির্বাচন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেছেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দরিদ্র নারীদের খাদ্য নিরাপত্তায় ভিজিডি এবং সুস্থ শিশু জন্মদান নিশ্চিত করার জন্য মাতৃত্বকালীনভাতা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুবিধাভোগী নির্বাচন ডিজিটালাইজড করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ২রা আগস্ট রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সেভ দ্যা চিলড্রেন আয়োজিত বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ওপর দিনব্যাপী কর্মশালায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ভিজিডি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবাভাতা প্রভৃতি সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং তার সুফল প্রান্তিক মানুষ পাচ্ছে কি-না সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে গণপরিবহণ জরিপ

গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফেরাতে রুট পারমিট যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ ও সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। ৫ই আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত নগরীর সিআরবি সাতরাস্তার মোড় এলাকায় বিভিন্ন গণপরিবহণ জড়ো করে চালানো হয়েছে জরিপ কাজ। জরিপে উত্তীর্ণ গাড়িগুলোতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রাফিক বিভাগের বিশেষ স্টিকার। প্রথম দিন জরিপে উত্তীর্ণ ৬৪টি গাড়ি পায় স্টিকার। জরিপ শেষে রাস্তায় স্টিকার ছাড়া যানবাহন দেখলে আটক করা হবে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ। সূত্র মতে, প্রথম দিনে ১, ২ ও ৩ নম্বর রুটে চলাচলরত বাস ও মিনিবাস জরিপ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় জরিপে অংশ নেয় ৯৭টি বাস ও মিনিবাস। এরমধ্যে বিভিন্ন কাগজপত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৬৪টি গাড়ি। আর অনুত্তীর্ণ হয় ৩৩টি গাড়ি। উত্তীর্ণ গাড়িগুলোতে নির্দিষ্ট রুট নম্বর ও পরীক্ষিত স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া হয়।

বরিশাল–ভোলা মহাসড়কে হচ্ছে 'বরিশাল ফুল সরণি'

এদেশে প্রথম 'বরিশাল ফুল সরণি' বিনির্মাণ করা হচ্ছে বরিশাল–ভোলা মহাসড়কের প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে।

১৫ই জুলাই মহাসড়কের বিশ্ববিদ্যালয় মোড় (হিরণ পয়েন্ট) থেকে চরকাউয়া জিরো পয়েন্টে ৪.৮ কিলোমিটার (৪৮০০ মিটার) সড়কের দুই পাশে কৃষ্ণচূড়া, সোনালু ও জারুল গাছের ৩ হাজার চারা রোপণের মাধ্যমে বিনির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এজন্য চারা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ ২ লাখ টাকা বরাদ্দ করে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা–আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটির দৈর্ঘ্য হবে ২৪ কিলোমিটার

খুব শিগগিরই আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে প্রস্তাবিত ঢাকা–আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের চূড়ান্ত নকশা অনুমোদিত হয়েছে। এ উড়াল সড়কটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়ক থেকে শুরু হয়ে ইপিজেড–চন্দ্রা ইন্টারসেকশনে গিয়ে শেষ হবে। এ এক্সপ্রেসওয়েটির মোট দৈর্ঘ্য হবে ২৪ কিলোমিটার। এর উভয় পাশে চার লেনের ১৪ দশমিক ২৮ কিলোমিটার সংযোগ সড়কও নির্মাণ হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা ও এর পাশের আশুলিয়া অংশের যানজট নিরসন হবে অনেকাংশে। এছাড়া ঢাকার সঙ্গে দেশের উত্তর ও পশ্চিমের অন্তত ৩০টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ

হবে। উত্তরবঙ্গগামী যাত্রীদের ঢাকা ছাড়ার জন্য গাবতলী, সাভার ও চন্দ্রায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে বসে থাকার প্রয়োজন হবে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা থেকে চন্দ্রা পৌঁছে যাবে এসব গাড়ি। এছাড়া এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে যানজটমুক্ত হবে আবদুল্লাহপুর–আশুলিয়া–বাইপাইল–চন্দ্রা এলাকা। এ প্রকল্পটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে চায়না ন্যাশনাল সেমিনারি ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি)। এ প্রকল্প নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭ হাজার ৯ কোটি ১৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে ৪ শতাংশ সুদে ১০ হাজার ৯৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা ঋণ দিবে চায়না এক্সিম ব্যাংক। বাকি অর্থের জোগান দেবে সরকার। **প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন**

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

সকল জেলায় হবে শিশু হাসপাতাল

শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশুমৃত্যু হার কমাতে সরকার বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৫ই আগস্ট রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শিশু হাসপাতালে ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো কর্মসূচির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় শিশু হাসপাতাল করা হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সরকার দ্রুত বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে ১০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। নিয়োগ দিয়ে সারাদেশের মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসক সংকট নিরসন করা হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরো ৪ হাজার জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বিএসএমইউ'র গবেষণা

শিশুর জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধ করবে ফলিক অ্যাসিড

এসডিজি অর্জনে চিকিৎসকগণ প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের উদ্যোগে 'স্ট্রেনদিং অব হসপিটাল নিউবর্ন কেয়ার থ্রো এক্সপানডিং দি ন্যাশনাল নিউনেটাল পেরিনেটাল ডাটাবেজ (এনএনপিডি) অ্যান্ড নিউবর্ন বার্থ ডিফেক্ট (এবিবিডি) সার্ভিলেন্স ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক গবেষণায় চিকিৎসকগণ দেখেন, মা হতে ইচ্ছুক এমন মায়েরাসহ গর্ভবতী মায়েরা ফলিক অ্যাসিড ব্যবহার করলে অনেকাংশেই শিশুর জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিএসএমএমইউ-এর গবেষণা অনুযায়ী, প্রতি একশ জনে ৪ জন নবজাতকের জন্মগত ত্রুটি লক্ষ করা যায়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এ হার প্রতি একশ জন্মে ৩–৬ শতাংশ। এই গবেষণায় ১৪টি মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে। এই গবেষণার মাধ্যমে জন্মগত ত্রুটির কারণ শনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও জন্মগত ত্রুটির চিকিৎসা সহজ হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো.আব্দুল মান্নান এ তথ্য জানান। তিনি আরো বলেন, আমরা ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি-৪ অর্জন করেছি। এখন আমাদের টার্গেট এসডিজি অর্জন করা। এই এসডিজি অর্জন করতে হলে প্রতিরোধমূলক রোগের ওপর জোর দিতে হবে।

শিশুমৃত্যু রোধে নবজাতকের ৫টি সেবা নিশ্চিত করতে হবে

দেশে শিশুদের একটি বড়ো অংশ মারা যাচ্ছে জন্মের প্রথম ২৮ দিনে। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, জন্মের পরেই নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করা গেলে শিশুমৃত্যু হার অনেকাংশে কমানো সম্ভব। সেবাগুলো হলো– শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বুকের দুধ পান করানো, জন্মের পাঁচ মিনিটের মধ্যে নবজাতকের শরীর মুছে ফেলা, জন্মের পরের তিন দিন নবজাতককে গোসল না করানো, নবজাতকের নাভিতে কোনো কিছু না লাগানো এবং প্রসব ও নাভি কাটার ক্ষেত্রে নিরাপদ সামগ্রী ব্যবহার।

১০ই আগস্ট রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে আয়োজিত 'নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকরা এ বক্তব্য দেন। ইউনিসেফের সহযোগিতায় বৈঠকটির আয়োজন করে *প্রথম আলো*।

বৈঠকের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতকের মৃত্যু প্রতি হাজারে ১২, শিশুমৃত্যু ২৫ এবং প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু ৭০-এ নামাতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা, খাদ্য, পুষ্টি, নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিতে হবে।

এছাড়া প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে প্রসবের মাত্র ৪০ শতাংশ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। বাকি প্রসব হচ্ছে বাড়িতে। লোকজনকে হাসপাতালে, ক্লিনিকে আসতে সচেতন করতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রশিক্ষিত জনবল ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। **প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন**

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সচেতন হতে হবে পরিবারকে

'মাদক' যেন এক বিষধর সাপের নাম। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মাদক। এটি শুধু ব্যক্তি জীবনকেই ধ্বংস করে না, তার সাথে ধ্বংস করছে একটি পরিবার, সমাজ-জাতি। একটি পরিবারের কেউ যখন মাদকাসক্ত হয় তখন পরিবারের অন্য সদস্যরা সহজেই তা টের পায় না। কারণ, আমাদের সমাজের অনেক অভিবাবকই আছেন যারা মাদকাসক্তি কী, এর লক্ষণগুলো কী, কীভাবে ছেলেমেয়েদের এর থেকে দূরে সরানো যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো জানেন না।

একজন অভিভাবক মাদকাসক্তের বিভিন্ন উপসর্গ দেখে নিজেই চিহ্নিত করতে পারেন তার আদরের সন্তানটি মাদক গ্রহণ করছে কি-না। সাধারণত মাদকাসক্ত ব্যক্তির আচরণ, অভ্যাস এবং চলনে নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহ দেখা যায়–

- হঠাৎ নতুন বন্ধুদের সাথে চলাফেরা শুরু করা।
- বিভিন্ন অজুহাতে ঘন ঘন টাকা চাওয়া।
- আগের তুলনায় দেরিতে বাড়িতে ফেরা।
- রাতে জেগে থাকা এবং দিনে ঘুমের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া।
- ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর অস্বাভাবিক আচরণ করা।
- খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দেওয়া।
- ওজন কমে যাওয়া।
- অতিরিক্ত মাত্রায় মিষ্টি খেতে আরম্ভ করা।
- মাত্রাতিরিক্ত চা-পান-সিগারেট খাওয়া।
- মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া।

- অযথা টয়লেটে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা।
- ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া।
- প্রচুর ঘুম হওয়া অস্থিরতা এবং অস্বস্তি বোধ করা।
- যৌন ক্রিয়ায় অনীহা এবং যৌন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া।
- মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা।
- পরিবারের সদস্যদের সাথে মনোমালিন্য।
- অকারণে বিরক্তবোধ করা। হঠাৎ মন-মানসিকতার পরিবর্তন দেখা দেওয়া।
- লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অনীহা।
- কাপড়চোপড়ে দুর্গন্ধ বৃদ্ধি পাওয়া ও পোড়া দাগ থাকা।
- ঘরে তামাকের বা সিগারেটের টুকরা পড়ে থাকা।
- ঘরে প্লাস্টিকের বা কাচের বোতল, কাগজের পুরিয়া, ইনজেকশন, খালি শিশি পোড়ানো দিয়াশলাই-এর কাঠিসহ নানাবিধ অস্বাভাবিক জিনিস বৃদ্ধি পাওয়া।

উল্লিখিত এক বা একাধিক বিষয় পরিলক্ষিত হলে একজন সচেতন বাবা-মায়ের বোঝা উচিত তার সন্তানটি মাদকের দিকে হাত বাড়িয়েছে। যুবসমাজকে মাদকের কালো থাবা থেকে রক্ষা করতে তাই প্রত্যেক পরিবারের সচেতন হতে হবে। সরকার যতই মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করুক না কেন, আমরা নিজেরা যদি সচেতন না হই তাহলে এর ধ্বংস থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তরুণসমাজ আগামীর ভবিষ্যৎ। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তাদের। তারা যদি মাদকে আসক্ত হয় তাহলে এর পরিণতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা কল্পনাতীত। তাই প্রত্যেকের উচিত মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। **প্রতিবেদক: এনায়েত হোসেন**

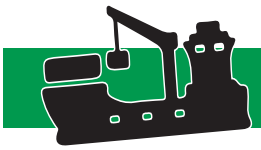

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ

২৮শে জুলাই প্রকাশিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটেসটিকস রিভিউ ২০১৭' প্রতিবেদন অনুযায়ী, একক দেশ হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে তার অবস্থান ধরে রেখেছে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে গত বছর বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), ভিয়েতনাম, ভারত, হংকংয়ের মতো দেশকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ।

২০১৬ সালে বাংলাদেশ মোট ২ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হলেও ইইউ জোট হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। সব মিলিয়ে গত বছর বিশ্বের মোট রপ্তানিকৃত পোশাকের ৬ দশমিক ৪ শতাংশ বাংলাদেশের। বাংলাদেশের পরে সেরা ১০-এ রয়েছে যথাক্রমে ভারত, হংকং, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে পোশাক রপ্তানিতে এবারো শীর্ষ অবস্থানে আছে চীন।

উচ্চ প্রযুক্তির জাহাজ রপ্তানিতে বাংলাদেশ

দেশের দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম জাহাজ নির্মাণশিল্প। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ। বাংলাদেশ এবার প্রথম উচ্চ প্রযুক্তির জাহাজ রপ্তানি করছে। কেনিয়ায় রপ্তানির জন্য চট্টগ্রামের ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা রপ্তানি মূল্যের একটি উচ্চ প্রযুক্তির জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। রপ্তানির আগে ১৩ই আগস্ট ২০১৭ জাহাজটির 'ইয়ার্ড ডেলিভারি' কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

'অফশোর পেট্রোল ভেসেল' হিসেবে পরিচিত বিশেষায়িত এই জাহাজটির নাম 'দরিয়া'। ছোটো আকারের হলেও জাহাজটির রপ্তানি মূল্য ১৮ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। এটি রপ্তানির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো উচ্চ প্রযুক্তির জাহাজ নির্মাণের বাজারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের আয় বাড়ছে

প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানিতে বেশ ভালো করছে দেশের বড়ো কোম্পানিগুলো। তাদের উৎপাদিত রুটি-বিস্কুট-চানাচুর, পানীয়, মসলা, জ্যাম-জেলি, সরিষার তেল ইত্যাদি পণ্যে রপ্তানি আয় বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো পুরোনো বাজারের পাশাপাশি আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে এসব পণ্যের বাজার। অন্যদিকে শুধু প্রবাসী বাংলাদেশিরা নন, আমদানিকারক দেশগুলোর নাগরিকেরাও বাংলাদেশি পণ্য কেনা শুরু করেছেন বলে দাবি রপ্তানিকারকদের।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৩ কোটি ৫২ লাখ ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে ২ শতাংশ বেশি।

রপ্তানিতে অবদান রাখলে পুরস্কৃত করা হবে

দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে কোনো জেলা প্রশাসক বিশেষ অবদান রাখলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশ ভ্রমণ ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। গত ২৬শে জুলাই ২০১৭ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াবলি' শীর্ষক অধিবেশনে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশে এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 'ওয়ান ডিস্ট্রিক ওয়ান প্রোডাক্ট' প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা থেকে একটি করে পণ্য যদি রপ্তানি করা যায়, তাহলে রপ্তানির পরিমাণ অনেক বাড়বে। এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য এখন প্রায় ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালে দেশের রপ্তানির পরিমাণ ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। **প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে**

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

নভোথিয়েটারে আগস্ট মাসজুড়ে বিনামূল্যে ডিজিটাল চলচ্চিত্র প্রদর্শন

স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ওপর নির্মিত 'ডিজিটাল চলচ্চিত্র' আগস্ট মাসজুড়ে বিনামূল্যে প্রদর্শন কর্মসূচি ১লা আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্লানেটেরিয়ামে উদ্‌বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার এ কর্মসূচির আয়োজন করে। ১লা আগস্টে নভোথিয়েটারে ১ম প্রদর্শনী সকাল সাড়ে দশটা থেকে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে দেখানো হয়।

নবম আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব

আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের নবম আসর ১১ই আগস্ট থেকে শুরু হয়। এ উৎসবে চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ১২ই আগস্ট বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে এই বিশেষ প্রদর্শনী হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ এই উৎসবের আয়োজন করে। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে প্রথম আলো। উৎসবে ৯৬টি দেশ থেকে ১ হাজার ৭০২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র জমা পড়ে। এরমধ্যে সারাদেশের ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্মাণ করা ১৩৭টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র রয়েছে। এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের স্লোগান– 'টেক ইউর ক্যামেরা, ফ্রেম ইউর ড্রিম'। ১৫ ও ২০ মিনিটের দুটো ক্যাটাগরিতে এসব চলচ্চিত্র জমা পড়ে। এগুলোর মধ্যে নির্বাচিত ডকুমেন্টারি, অ্যানিমেশন, ফিকশন এবং নন-ফিকশনসহ ২০০টির মতো চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

জহির রায়হান চলচ্চিত্র উৎসব

জহির রায়হানের ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় 'জহির রায়হান চলচ্চিত্র উৎসব'। 'প্রতিরোধে প্রস্তুত ক্যামেরা'– স্লোগান নিয়ে ১৮ ও ১৯শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। এ উৎসবের আয়োজন করেছে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ঢাকা মহানগর সংসদ। উৎসবে ৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৮ আগস্ট সকাল ১০টায় এ উৎসবের উদ্‌বোধন করা হয়। ঐদিন দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রদর্শিত হয় জহির রায়হান নির্মিত তথ্যচিত্র *দ্য স্টেট ইজ বর্ন* দুপুর আড়াইটায় তৌকির আহমেদের ছবি *অজ্ঞাতনামা* বিকাল ৫টায় কামার আহমাদ সাইমনের তথ্যচিত্র *একটি সুতার জবানবন্দি* ও সন্ধ্যা ৭টায় দেখানো হয় তানভীর মোকাম্মেলের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *জীবনঢুলী*। ১৯শে আগস্ট সকাল ১০টায় স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি *পুনরাবৃত্তি* সাড়ে ১০টায় ছিল স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি *উপসংহার* এবং ১১টায় জাহিদুর রহিম অঞ্জন পরিচালিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *মেঘমল্লার* প্রদর্শিত হয়।

ঈদে তিন ছবি

ঈদুল আজহায় মুক্তি পাচ্ছে তিনটি ছবি। শাকিব-বুবলি অভিনীত *রংবাজ* ও *অহংকার*, আর ডিএ তায়েব, পপি, পরিমণীর *সোনাবন্ধু* ছবিগুলো মুক্তি পাচ্ছে। যার মধ্যে *রংবাজ* আর *অহংকার* ছবি দুটি দুই শতাধিক সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে। অন্যদিকে *সোনা বন্ধু* মুক্তি পাচ্ছে অর্ধশতাধিক সিনেমা হলে।

প্রতিবেদন : মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

সেরা বাঙালি পুরস্কারে ভূষিত মাশরাফি

বাংলাদেশের ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'সেরা বাঙালি' পুরস্কার পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মাশরাফি। এর আগে বাংলাদেশের হাবিবুল বাশার ও সাকিব আল হাসান মর্যাদাপূর্ণ এ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

পাঁচ বছর পর বাংলাদেশের এ ক্রিকেটার সম্মানসূচক এ অ্যাওয়ার্ডটি পেলেন। কলকাতার এবিসি মিডিয়া গ্রুপ প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা বাঙালিদের পুরস্কৃত করে থাকে। এবারের সংস্করণে খেলোয়াড় বিভাগে সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়ে সেরা বাঙালি খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন টাইগারদের বর্তমান ওয়ানডে অধিনায়ক মাশরাফি বিন মরতুজা।

আফগানিস্তানের যুবদল আসছে সেপ্টেম্বরে

যুব ক্রিকেট বিশ্বকাপের সর্বশেষ আসরে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল বাংলাদেশ। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে যুব ক্রিকেট সর্বোচ্চ সাফল্য পেয়েছিল লাল-সবুজের এ দলটি।

আগামী জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে যুব বিশ্বকাপ জুনিয়র টাইগারদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু প্রত্যাশা করছে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তাই যুবাদের জন্য ইতোমধ্যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান কোচ ড্যানিয়েল মার্টিনকে। তার ধারাবাহিকতায় প্রস্তুতি হিসেবে পাঁচটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আফগান যুবাদের। আফগানিস্তানও খেলতে সম্মতি জানিয়েছে। **প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 38, No. 03, September 2017, Tk. 25.00

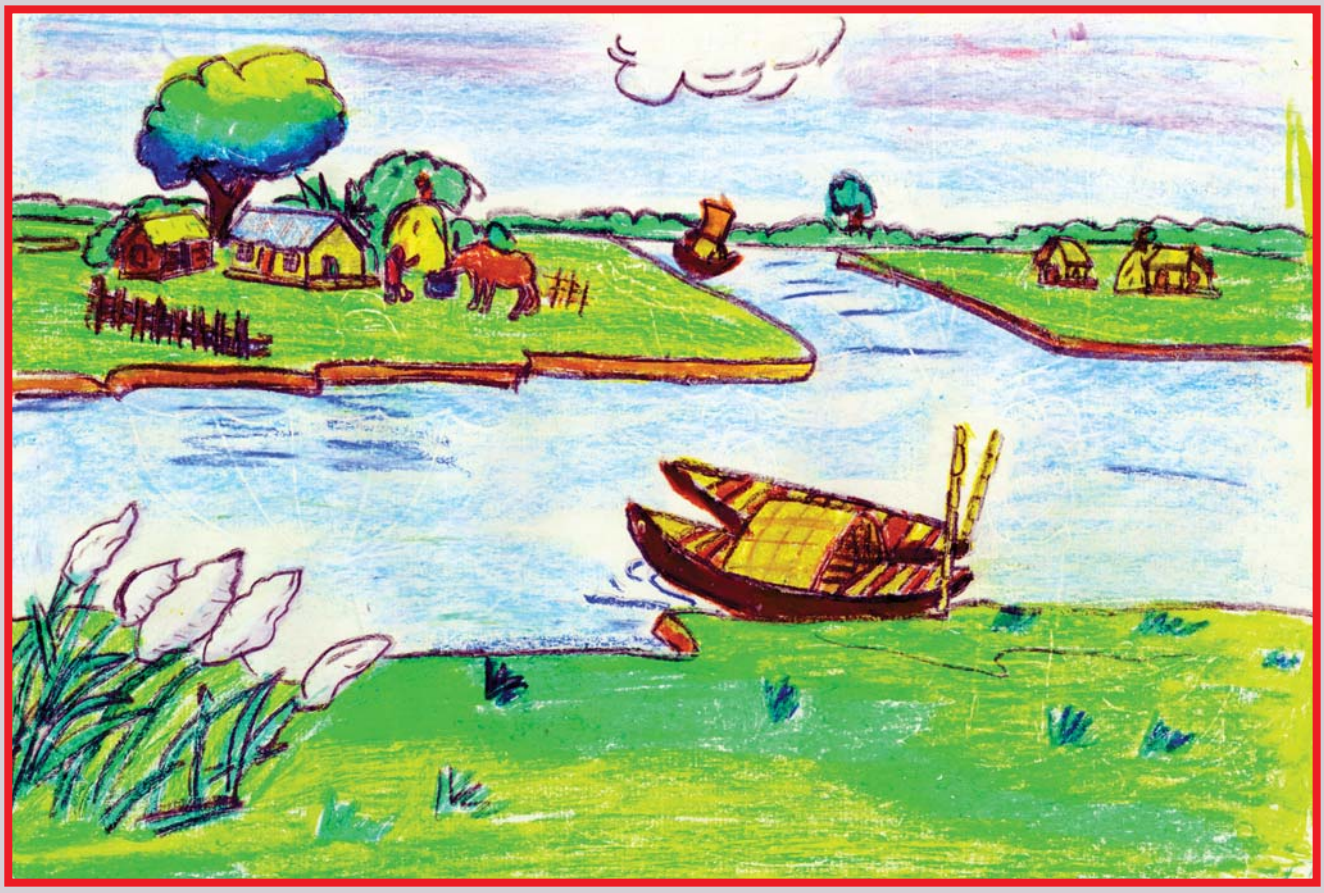

সৈয়দ আদনান সাকিব (পিয়াল), ৪র্থ শ্রেণি, বাংলাদেশ এলিমেন্টারি স্কুল, চট্টগ্রাম

DFP

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা